বঙ্গ

কমলবার্তা

অগাস্ট সংখ্যা। ২০২৪

জ্বলছে আগুন ধিকিধিকি...

এই মেয়ে তোর রেট কত?

ভারত মায়ের বিভাজনের বিভীষিকা

সেনার দখলে সোনার বাংলাদেশ
কপাল পুড়লো হিন্দুদের

অলিম্পিকে ভারত
এগোচ্ছে দেশ, অন্ধকারে বাংলা

জোট বেঁধেছে
বাঙাল - ঘটি

মানবতাবাদী
রাধাগোবিন্দ কর

জাস্টিস ফর আরজি কর

নয়া দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে রাখী উৎসব উদযাপনে সহাস্য নরেন্দ্র মোদী।

ইউক্রেন সফরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী,
সঙ্গে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনেস্কি।

ঐতিহাসিক পোল্যান্ড সফরে পোল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট
আন্দ্রেজ ডুদা-র সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

ধস-বিধ্বস্ত ওয়ানাদে-এর ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

কেরালার ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্তদের সুস্থতার খোঁজ নিতে অ্যাস্টার
ওয়ানাড স্পেশালিটি হাসপাতালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বঙ্গ
কমলবার্তা
অগাস্ট সংখ্যা। ২০২৪

এই মেয়ে তোর রেট কত? ৪
স্বাতী সেনাপতি
জোট বেঁধেছে বাঙাল-ঘটি ৬
জয়ন্ত গুহ
মানবতাবাদী রাধাগোবিন্দ কর ৯
বিনয়ভূষণ দাশ
অভয়ার বিচার ও মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে: লাগাতার আন্দোলনে বিজেপি ১১
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়
জাস্টিস ফর আরজি কর ১৩
সাহানা মুখোপাধ্যায়
ছবিতে খবর ১৬
ভারত মায়ের বিভাজনের বিভীষিকা ২২
অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়
জামাত ও সেনার দখলে বাংলাদেশঃ কপাল পুড়লো হিন্দুদের ২৫
সৌভিক দত্ত
ভারত-রুশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ২৮
অনিকেত মহাপাত্র
অলিম্পিকে ভারতঃ এগোচ্ছে দেশ, অন্ধকারে বাংলা ৩০
অভিরূপ ঘোষ
ফেক নিউজ ৩৩

সম্পাদক: জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
কার্যনির্বাহী সম্পাদক : অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়
সহযোগী সম্পাদক : জয়ন্ত গুহ
সম্পাদকমন্ডলী:
অভিরূপ ঘোষ, কৌশিক কর্মকার, সৌভিক দত্ত, অনিকেত মহাপাত্র
সার্কুলেশন: সঞ্জয় শর্মা

সম্পাদকীয়

এক মুহূর্তের জন্য ধরে নিন আপনার কোন নাম নেই। থাকলেও একডাকে সবাই চেনেনা। বাঘে গরুতে একঘাটে জল খায়না। নিশ্ছিদ্র পুলিশি নিরাপত্তার বেষ্টনী নেই। পুলিশ কমিশনারকে ফোন তো দূরের কথা, আপনি ফোন করলে হয়ত কোন থানার ওসিও পাত্তা দেবেনা। ধরে নিন আপনি একেবারেই এক সাধারণ মধ্যবিত্ত মেয়ে। ধরা যাক আপনি আরজি করে পড়াশুনা করেন। অভয়ার সহপাঠী। অভয়ার নৃশংস খুনের ঘটনার পর আপনি কি করতেন? মাটি কামড়ে অভয়ার বিচারের দাবীতে তীব্র প্রতিবাদ জানাতেন নাকি যারা প্রতিবাদ জানাচ্ছে তাঁদের বিরুদ্ধে 'ফোঁস' করে উঠতেন? নাকি প্রতিবাদের বিরুদ্ধে অনেক লোকজনকে 'ফোঁস' করার পরামর্শ দিতেন? আপনার মনে কি প্রশ্ন উঠত না যে ১৪ আগস্টের রাতে কারা এসেছিল আরজি করে ভাঙচুর করতে? পুলিশের কাছে ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট ছিলনা কেন? খেলার মাঠে প্রতিবাদ হবে, এটা পুলিশ আগে থেকে অনুমান করতে পারে। অথচ আরজি করে মধ্যরাতে ভাঙচুর হতে পারে সেটা পুলিশ জানতে পারল না? কেন ছাত্র সমাজের ডাকে নবান্ন অভিযানে পুলিশ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছিল? কারও হাতে কি একে ৫৭ বা ৪৭ ছিল? পিস্তল বা নিদেনপক্ষে গাদা বন্দুক বা মুড়ো ঝাঁটা ছিল? পুলিশের হাতে আটক আন্দোলনকারীদের ছাড়াতে গিয়ে কি অন্যায় করেছিল রাজ্যের বিজেপি নেতৃত্ব? তাঁরা তো জঙ্গি দলের স্লিপার সেলের কোন সদস্যকে ছাড়াতে যায়নি। রাজ্যের মহিলা কমিশনের রহস্যময় নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে কি অন্যায় করেছে বিজেপি? শ্যামবাজার বা ধর্মতলায় ধর্না মঞ্চে বসে বিজেপি কি সাধারণ মানুষের প্রতিবাদের বিরুদ্ধে 'ফোঁস' করার পরামর্শ দিয়েছে? না দেয়নি, লাগাতার শুধু প্রতিবাদ আর প্রশ্ন তুলছে একটি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থায় নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন অভয়া এবং খুন হবার পর প্রমাণ লোপাটেরও অভিযোগ উঠছে সেই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে।

সাধারণ মানুষ হলে আপনিও প্রতিবাদ করতেন। জবাব চাইতেন সরকারের কাছে? জবাব চাইতেন পুলিশি তদন্তের? আপনি প্রশ্ন তুলতেন প্রমাণ লোপাটের। প্রশ্ন তুলতেন সরকারি কলেজে একজন ডাক্তারি পড়ুয়ার কেন নিরাপত্তা নেই? কেন আরজি কর এবং ডাক্তারি কলেজগুলোতে তৃণমূলের দাদাগিরি? দাদাগিরি কার ছত্রছায়ায়? কেন রাজ্যে মহিলারা সুরক্ষিত নয়?

সাধারণ মানুষের এই প্রশ্নগুলোই করছে বিজেপি এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থে লাগাতার করবে প্রশ্ন। উত্তর দিতে হবেই আপনাকে তা সে যত বড়ই ক্ষমতাশালী হন না আপনি। কেননা যে প্রশ্ন তুলছে বিজেপি সে প্রশ্ন সাধারণ মানুষের যাদের করের পয়সায় চলে সরকার। উত্তর দিতেই হবে।

জয় হিন্দ।

এই মেয়ে তোর রেট কত?

স্বাতী সেনাপতি

'প্রবল ক্ষমতাশালী' সব সত্যিকে মিথ্যে করে দিতে পারে। নারীকে 'মেয়েমানুষ' করে রাখে, মানুষ হতে দেয়না। যা খুশী তাই করতে পারে, কোন তোয়াক্কা না করে। ততক্ষণ অবধি করতে পারে যতক্ষণ না নারী শক্তির স্পর্ধা ও জেদ মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে রাজপথে। অভয়ার বিচারের দাবীতে, নিজের ঘরের মেয়ের সুরক্ষার দাবীতে এবার পথে নেমেছে বাংলার মা-বোনেরা। এ লড়াই আপোষহীন পরিবর্তনের লড়াই।

২০১২ সালের সেপ্টেম্বর মাস। পর্কস্ট্রিট গণধর্ষণ কান্ডের পর পেরিয়ে গিয়েছে বেশ কয়েকমাস। সরকারের ভূমিকা সমালোচিত হচ্ছে দিকে দিকে। নানা জায়গা থেকে খবর আসছে ধর্ষিতা হচ্ছেন মহিলারা। বেরিয়েছে এনসিআরবি রিপোর্ট। তাতে দেখা যাচ্ছে দেশের মধ্যে নারী নির্যাতনে সবথেকে এগিয়ে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। ধর্ষণ হোক বা যৌণ হেনস্থা, শিশু কন্যা পাচার হোক বা গার্হস্থ্য হিংসা, অ্যাসিড হামলা হোক বা মহিলাদের উপর সার্বিক অত্যাচার সবেতেই "এগিয়ে বাংলা"। এমন সময় মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন ধর্ষণের রেটচার্ট! ঠিক কি বলেছিলেন তিনি?

"কেউ হয়ত ধর্ষিত হয়েছে, সত্যিই ধর্ষিত হয়েছে। তার তো একটা কম্পেনশেশন পাওয়া উচিত। গভর্মেন্ট তাকে দেবে। ধরুন, মিথ্যা কথা বলে নয়, সত্যি কথা বলে, সেটা গভর্মেন্ট- এর কাছে আসবে, কেস টু কেস দেখে আমরা সিদ্ধান্ত নেব," বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। তাঁর এই কথার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে এক ভয়ঙ্কর প্রবণতা। ধর্ষণকে ধামা চাপা দেওয়ার প্রবণতা। সেদিনের মুখ্যমন্ত্রীর ধর্ষণের ক্ষতিপূরণ বা রেট ঘোষণার পর রাজ্য সরকারের তরফে তালিকা প্রকাশ করা হয় কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের মাত্রা কেমন।

নাবালিকা ধর্ষিতা হলে টাকার পরিমাণ ৩০ হাজার, প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে ২০ হাজার টাকা। অত্যাচারে প্রাণহানি হলে ২ লক্ষ টাকা এবং অঙ্গহানি হলে ১০ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা। মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হলে ১০ হাজার এবং শিশুরা অত্যাচারিত হলে ১০ হাজার টাকা। সাধু উদ্যোগই বটে। ধর্ষকদের না শাস্তি দিয়ে, তাদের পালানোর বন্দোবস্ত করে, ধর্ষণকে সাজানো ঘটনা বলে দাগিয়ে দিয়ে ধর্ষণের রেট বেঁধে দেওয়া! সাম্প্রতিক কালে তিনি আরজি কাণ্ডে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করতে গিয়ে বলেছিলেন "১০ লক্ষ টাকা তো আমরা দিতেই পারি" যা গোটা দেশ দেখেছে এবং ধিক্কার জানিয়েছে। যথারীতি ক্ষতিপূরণের বলিষ্ঠ প্রত্যাখ্যানও জানিয়েছেন অভয়ার মা-বাবা।

কিন্তু শাসকের চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন ওঠে বা সদর্থক ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে যখন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে বেড়ে চলা ধর্ষণের ঘটনাগুলোকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন। বিশেষত মুখ্যমন্ত্রী যখন নিজেই মহিলা! কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কি বরাবরই এমন ছিলেন? আসুন একটু ফিরে দেখা যাক।

মমতা বন্দোপাধ্যায় যখন বিরোধী

১৯৯৩ সালের ৭ জানুয়ারি নদীয়ায় এক মুক ও বধির ধর্ষিতাকে নিয়ে বিচার চাইতে তিনি চলে যান রাইটার্স বিল্ডিংয়ে। রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি ছিল সিপিএমের হার্মাদ বাহিনীর হাতে ধর্ষিতা হয়েছেন ওই মুক ও বধির মহিলা। সেই সময় টেনে হিঁচড়ে বের করে দেওয়া হয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সিঙ্গুরের বাজেমেলিয়া গ্রামের বাসিন্দা ১৬ বছরের কিশোরী তাপসী মালিককে ধর্ষণ করে খুন করা হয় এবং প্রমাণ লোপাটের উদ্দেশ্যে দেহ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছিলেন। পরবর্তীতে এই কেসটি সিবিআইয়ের হাতেই তুলে দেওয়া হয়। এটা তো গেল যখন তিনি এই রাজ্যে বিরোধীর আসনে ছিলেন। কিন্তু - **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন শাসক,** তখন তাঁর প্রকাশের ধরণ কিন্তু একেবারে অন্যরকম।

২০১১ সাল, পার্কস্ট্রিট ধর্ষণ কাণ্ড

সদ্য কয়েকমাস হল বাম জামানার অবসান ঘটিয়ে পশ্চিমবঙ্গের ত্রাতার ভূমিকায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। এমন সময়ই ঘটে নববর্ষের রাতে ঘটে পার্কস্ট্রিট গনধর্ষন কাণ্ড। মুখ্যমন্ত্রীর প্রথম বক্তব্য ছিল "সাজানো ঘটনা, সরকারের বদনাম করার জন্য বলছে ওরা"। সাজানো ঘটনা নয় এটা বলার পর তদন্তকারী অফিসার দময়ন্তী সেনকে বদলি করে দেন রাতারাতি। যদিও প্রায় সাড়ে তিনবছর পর গণধর্ষণেই সিলমোহর দেয় আদালত।

২০১২, কাটোয়া গণধর্ষণ কাণ্ড

কাটোয়া গণধর্ষণ কাণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর বয়ান ছিল, "মহিলার স্বামী সিপিএম। রাজ্য সরকারকে অপদস্থ করতেই ওই মহিলা ধর্ষণের সাজানো অভিযোগ এনেছেন।" পরবর্তীতে গণধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত আট জনের মধ্যে নয়ন শেখ, রেজাউল শেখ, সেন্টু শেখ, স্বপন শেখ, নূর মহম্মদ, ফরিদ শেখ ও কালাম শেখকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। যদিও এমনভাবে পুলিশের তরফে কেস সাজানো হয় যে ৭ জনই বেকসুর খালাস হয়ে যায়!

২০১২ সাল - 'জাগো বাংলা'-য় মুখ্যমন্ত্রীর ভাবনা

২০১২ সালের, ১৫ অক্টোবর দলীয় মুখপত্র 'জাগো বাংলা'র অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, 'দিনকাল বদলে গিয়েছে। আগে ছেলেমেয়েরা লুকিয়ে-চুরিয়ে প্রেম করত। এখন ছেলেমেয়েরা খোলামেলা ভাবেই মেলামেশা করে। এখন সব ওপেন। এখন কাউকে নিষেধ করলে শুনবে?' অর্থাৎ বারবারই ধর্ষণকে প্রেম, লাভ অ্যাফেয়ার্স বলে চালানোর চেষ্টা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

২০১৩ সালে বিধানসভায় জবাবী ভাষণ

বিধানসভায় রাজ্যপালের ভাষণের উপর জবাবি বক্তৃতায় মুখ্যমন্ত্রী বিরোধীদের উদ্দেশে বলেন, 'আপনারা বলছেন ধর্ষণ বাড়ছে। কিন্তু রাজ্যের লোকসংখ্যাও তো বাড়ছে। বিধান রায়ের আমলে রাজ্যের জনসংখ্যা যা ছিল, এখন কি তাই আছে? মানুষ বাড়ছে, গাড়ি বাড়ছে, পরিকাঠামো বাড়ছে, শপিং মল বাড়ছে, আইনক্স বাড়ছে। ছেলেমেয়েরা আধুনিক হচ্ছে। এই আধুনিকতাকে তো স্বাগত জানাতেই হবে।'

২০১৩, কামদুনি গণধর্ষণ কাণ্ড

যে মুখ্যমন্ত্রী যখন হাতরাসে ছুটে যান, তিনিই তাঁর রাজ্যের তাঁর বাড়ি থেকে কয়েক ঘন্টা দূরে ঘটে যাওয়া কামদুনি কাণ্ডে নির্যাতিতার বাড়ি যেতে সময় নিয়েছিলেন পাক্কা দশদিন! দশদিন পর নির্যাতিতার বাড়িতে তিনি পাক্কা পাঁচ মিনিট ছিলেন। এত বড় মহানুভবতার উদাহরণ কেবল আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষেই দেখানো সম্ভব। বেরিয়ে আসার সময় তিনি ক্ষোভের মুখে পড়েন। বিক্ষোভকারীদের দিকে তেড়ে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "চুপ করুন, বেশি কথা বলবেন না।" পরে তিনি জানান অভিযুক্ত এবং বিক্ষোভকারীরা সবাই নাকি সিপিএমের সমর্থক! তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ধৃতদের বিরুদ্ধে ১৫ দিনের মধ্যে চার্জশিট পেশ করা হবে, এক মাসের মধ্যে শাস্তি এবং ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে বিচার হবে দোষীদের। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, দোষীদের ফাঁসি চাইবে রাজ্য সরকার। কিন্তু বাস্তবে কি দেখলাম! তৎকালীন সেই তদন্তের ভারপ্রাপ্ত অফিসার এই বিনীত গোয়েল (যিনি আরজি কাণ্ডের কভার আপে জড়িত বলে অভিযোগ) এমন ভাবেই চার্জশিট পেশ করে, এমনভাবে প্রমাণ লোপাট করা হয় যে আজ পর্যন্ত বিচার পেল না নির্যাতিতা।

এ তো গেল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনের শুরুর দিকের মন্তব্য। কিন্তু বিগত ১০ বছরে তিনি যে এতটুকু বদলাননি তার প্রমাণ তিনি আবারও দেন হাঁসখালি ধর্ষণ কাণ্ডে। তিনি বলেন "মেয়েটার সঙ্গে ছেলেটার লাভ অ্যাফেয়ার ছিল বলে আমি শুনেছি। সত্যিই ধর্ষণ হয়েছে, না প্রেগনেন্ট ছিল। না অন্য কোনও কারণ হয়েছে। না কি কেউ ধরে ২টো চড় মেরেছে। শরীরটা খারাপ হয়েছে"।

উপরের উদাহরণগুলো কয়েকটি নমুনা মাত্র। এছাড়াও অসংখ্যবার ধর্ষণ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের একাধিক মন্তব্য করতে শুনেছি আমরা। যা আদতে ইঙ্গিত দেয় এই রাজ্য সরকার ধর্ষকদের পক্ষে। আরজি কর কাণ্ডেও প্রকাশ্যে তিনি "নির্যাতিতার ফাঁসি চান, ধর্ষিতার ফাঁসি চান"। আসলে অসতর্ক মুহূর্তে মানুষের মুখ দিয়ে তার গভীর চেতনায় যে ভাবনা চলে তাই মুখে চলে আসে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও তার ব্যতিক্রম নয়। তাই কখনও তিনি ধর্ষণের রেট বেঁধে দেন আবার কখনও ধর্ষিতাকেই ফাঁসিতে চড়ান!

জোট বেঁধেছে বাঙাল-ঘটি

খেলা হবে? হবে কি খেলা?

জয়ন্ত গুহ

২০১১ সালে লড়াই করে ক্ষমতায় এসেছিলেন যিনি, আজ তাঁরই রাজত্বে বাঙাল-ঘটিকে জোট বেঁধে লড়াইয়ের কথা বলতে হচ্ছে, দেশের এক তরতাজা মহিলা ডাক্তারের নৃশংস খুনের বিরুদ্ধে। এ লড়াই থামার নয়। শেষ কোথায়? বলবে সময়।

একটা বিধিসম্মত সতর্কীকরণ দিয়ে শুরু করা যাক। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী আপনি আর 'খেলা হবে' স্লোগানটা দেবেন না। ফুটবল নিয়ে আর মঞ্চে উঠবেন না। এমনকি দীর্ঘদিন ধরে গ্যাস-অম্বলে আক্রান্ত কোনও অবসরপ্রাপ্ত স্ফীতোদর আমলা চোঁয়া ঢেকুর তুলে আপনার হাতে ফুটবল ধরিয়ে দিলেও আপনি ওপথে যাবেন না। ফুটবল থেকে আপনি দূরে থাকুন। ওই ফুটবলেই এখন আপনার শনির সাড়ে সাতি দশা। বাঙালির ফুটবল নিয়ে আপনি রাজনীতির খেলা খেলতে চেয়েছিলেন। ভদ্রলোক বাঙালি সেদিন কিছু বলেনি কিন্তু অভয়ার বিচারের দাবীতে পথে নেমে বাঙাল-ঘটির জোট বুঝিয়ে দিয়েছে ফুটবল নিয়ে আপনার ছেলেখেলা বাঙালি বরদাস্ত করেনি। আপনি আপনার ক্ষমতা দিয়ে ১৮ অগাস্ট ডুরান্ড কাপের ডার্বি ম্যাচ কেড়ে নিয়েছিলেন, কেড়ে নিতে চেয়েছিলেন আরজি কর হাসপাতালে অভয়ার নৃশংস মৃত্যুর বিরুদ্ধে আপনার সরকার ও দলের বিরুদ্ধে ওঠা ফুটবলপ্রেমী বাঙালির প্রতিবাদের ভাষা। প্রতিরোধে জোট বাঁধল বাঙাল-ঘটি। ময়দান নেমে এল রাজপথে। প্রতিরোধের ঢেউ থামাতে আপনি নামালেন বিশাল পুলিশবাহিনী। আপনার রাজনৈতিক ব্লান্ডার। আপনি আসলে আক্রমণ করলেন ফুটবল নিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে। ওপর থেকে দেখা যায়না কিন্তু ওটা আমাদের জেনেটিক কোড-এ আছে। ঘুমিয়ে ছিল দীর্ঘদিন, আপনি জাগিয়ে দিয়েছেন। অভয়ার বিচারের দাবীতে এবং ডার্বি ম্যাচ বানচালের দাবীতে সেদিনের সন্ধ্যায় বাঙাল-ঘটির ব্যবধান ঘুচিয়ে আসলে কলকাতার রাস্তায় নেমে এসেছিল হাজারো সুভাষ-ক্ষুদিরাম-প্রফুল্ল - প্রীতিলতা - মণিমালা আর মাতঙ্গিনীরা। স্লোগান নয়, বন্দেমাতরমের মত তাঁদের একটাই মন্ত্র ছিল – উই ওয়ান্ট জাস্টিস। আকাশছোঁয়া প্রতিরোধের স্পর্ধা মাত্র কয়েক ঘন্টায় আপনার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে ফুটবল, 'খেলা হবে' স্লোগান আর পালের হাওয়া। আর হ্যাঁ,

২০২২ সালে ফুটবলের শহর কলকাতার কাছে বাংলার বিখ্যাত 'মুখ-পাত্তর' প্রশ্ন রেখেছিল – মোহনবাগান মানেই কি তৃণমূল? সপাটে জবাব সেই সন্ধ্যাতেই দিয়েছে ব্রিটিশ বাংলায় জাতীয়তাবাদের অন্যতম আকাঙ্খা মোহনবাগানের অগণিত সমর্থক। সুতরাং সাধু সাবধান। ফুটবল থেকে আপনি নিরাপদ দূরত্বে থাকুন। স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। খুব যদি ভুল না করি, তাহলে ১৮ আগস্ট সন্ধ্যায় বাঙাল-ঘটি জোটের যে খেলা আমরা দেখেছি, সে খেলাই শেষ খেলা নয়। সেদিন আমরা বাঙালি জাতীয়তাবাদের ঢেউ দেখেছিলাম, পিছনে সুনামি আসছে।

১৮ অগাস্ট দুপুরবেলা মা ফ্লাইওভার হয়ে ৩টে নাগাদ যখন কলকাতা প্রেস ক্লাবে পৌঁছলাম তখন কিন্তু কিছুই বুঝতে পারিনি। ৭টা নাগাদ একটি অনুষ্ঠান শেষে যখন বাড়ি ফিরছি রাস্তা তখন প্রায় ফাঁকা। কিন্তু পার্ক সার্কাস থেকে মা ফ্লাইওভারে ওঠার মুখে বুঝতে পারলাম কিছু একটা ঘটেছে। কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে আছে গাড়ি। কি সেদিন ঘটেছিল আপনাদের জানা আছে। কিন্তু যা ঘটেছিল খুব একটা সহজ ঘটনা নয়। ৫৫ পেরনোর আগেই জীবনে এমন ঘটনার সাক্ষী থাকব, কোনদিন ভাবতেও পারিনি। ময়দানের চির প্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের সমর্থকরা এক হয়ে এক ইস্যুতে গলা মিলিয়ে প্রতিবাদ করবে – ডার্বি বাতিল করলে কর / জাস্টিস ফর আরজি কর – এই ঘটনা অকল্পনীয়। অবিশ্বাস্য। ১৯৮০ সালের ১৬ অগাস্ট ইডেনে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ম্যাচে যে দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছিল তার বোধহয় প্রায়শ্চিত্ত হল ২০২৪-এ ১৮ অগাস্ট, যখন অভয়ার বিচারের দাবীতে বাঙাল-ঘটির বাজখাই প্রতিরোধের সামনে এক লহমায় উড়ে গেল 'ভয় দেখানো'-র একঘেয়ে খেলা আর 'খেলা হবে-খেলা হবে'-র গ্যাসবেলুন। ভয় দেখিয়েরা আসলে সেদিন মুখোমুখি হয়েছিল, রাজনীতি থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাওয়া মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক বাঙালীর।

অসভ্যদের আস্ফালন সেদিন মুখোমুখি হয়েছিল বাঙালী জাতীয়তাবাদের। সেদিনের ঘটনা আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছে, চূড়ান্ত সহ্যশীল মধ্যবিত্ত বাঙালীর ধমনীতে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত এখনও অবিরত বইছে চিত্তরঞ্জন-সুভাষ-শ্যামাপ্রসাদের মুখোপাধ্যায়ের বাঙালী জাতীয়তাবাদ, প্রয়োজনে যা যেকোনও বালখিল্য আস্ফালন বা ফ্রাসট্রেটেড বাচালতাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে আঁস্তাকুড়ে। শক্তিপ্রয়োগে নয়, শুধুমাত্র মাথা তুলে দাঁড়ানোর স্পর্ধাই যথেষ্ট।

এই মাথা তুলে দাঁড়ানোটা খুব সোজা। কিন্তু শিরদাঁড়া না থাকলে বা বিক্রি করে দিলে বা যত্ন করে আলমারিতে তুলে রাখলে আর মাথা তুলে দাঁড়ানো যায়না। মাথা আর আকাশ ছোঁয়ার স্পর্ধা রাখেনা, গড়াগড়ি খায় অবহেলায় চটির ধুলোয়। জেগে ওঠার শব্দরা কিন্তু তখনও আসে মাঝেমাঝে তাঁর কাছে। শব্দরা তো বোঝেনা যে সে জীবিত না মৃত! একলা কড়িকাঠে শব্দরা ফিসফিস করে, 'আগুন দেখেছি আমি কত জানলায়' বা 'তুমি আসবে বলেই……' – উত্তরে খাঁ খাঁ করে এক সরীসৃপ শীতলতা। অপমানিত শব্দরা অগত্যা অবাঞ্ছিত ঝুল হয়ে ঝুলতে থাকে দেওয়ালে। ঠিক তখনই ভেসে আসে দমদার এক গান, 'আর কবে আর কবে / কণ্ঠ শক্তি পাবে?' সঙ্গেসঙ্গেই ধেয়ে আসে খিস্তি-খেউর আর অসাড় লেকচার। কিন্তু তাতে কি আর কণ্ঠকে থামানো যায়। যায়না। এভাবেই মাথা তুলে দাঁড়াতে হয়। যেমন দাঁড়িয়েছিলেন ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলার শৌভিক চক্রবর্তী, যেমন দাঁড়িয়েছে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান- মহামেডানের সমর্থক ভাইবোনেরা, যেমন দাঁড়িয়েছে বাঙাল-ঘটি, আর যারা সেদিন যুবভারতী স্টেডিয়ামের বাইরে জমায়েতে যেতে পারেননি এমন কোটি কোটি বাঙাল-ঘটির চোয়াল আরও শক্ত হয়েছে যখন তাঁরা টেলিভিশনে বা সমাজমাধ্যমে বারবার করে দেখেছে সেই দৃশ্য। লাল-হলুদ আর সবুজ-মেরুন জার্সি গায়ে দেওয়া সমর্থকদের ফুলবাগান থানার পুলিশ টেনে হিঁচড়ে প্রিজন ভ্যানে তুলছে। কেন কি দোষ করেছিল ওরা? ওরা কি আল-কায়দার সদস্য? জামাত-উল-মুজাহিদিনের সদস্য? ওরা কেউ কিন্তু তৃণমূলের শাহজাহান শেখ বা জয়ন্ত সিংহ বা জেসিবি-র মত এলাকায় সাধারণ মানুষের ওপর সন্ত্রাস চালায়নি। ওদের দোষ একটাই, ওরা বিচার চাইতে এসেছিল ওদের ঘরের মেয়ে, ওদের বোন অভয়ার জন্য। কিন্তু রাজনৈতিক রং, দল, মতামত ভুলে যখন সাধারণ মানুষ রাস্তায় নামে তখন এমন কিছু ঘটতে পারে যা কল্পনার অতীত। এমনটাই ঘটেছিল সেদিন। প্রিজন ভ্যানে দুই দলের সমর্থকদের ঠেলেঠুলে তুললেও ভ্যান কিন্তু এক ইঞ্চিও এগোতে পারল না। দুই দলের সমর্থকেরা গিয়ে দাঁড়াল ভ্যানের সামনে। সঙ্গে আকাশ ফাটানো স্লোগান – উই ওয়ান্ট জাস্টিস। বহু চেষ্টা করেও তাঁদের সরানো যায়নি। অসহায়ের মত হা করে দাঁড়িয়ে থাকলো পুলিশ। শেষমেশ ভ্যানের দরজা খুলে দেওয়া হল। নেমে এল আটক করা সমর্থকেরা। আরে বাবা, একটা স্বতস্ফুর্ত প্রতিরোধকে কখনও ভয় দেখিয়ে আটকানো যায়? যায়না। যত আটকাবে, ভয়

দেখাবে, হুমকি দেবে, গালাগালি দেবে তত আরও বেশী করে প্রতিরোধ হবে। হয়েছেও তাই। রেনবো-কে ২-০ গোলে যেদিন হারালো ইস্টবেঙ্গল সেদিন খেলা শুরু হতেই চোখে পড়েছে গোলপোস্টের পিছনে বিরাট লাল-হলুদ ব্যানার। তাতে লেখা – তোমার স্বর, আমার স্বর, পাশে আছি আরজি কর। প্রথম গোল হতেই সাইডলাইন থেকে একটি লাল জার্সি নিয়ে গ্যালারির সামনে দাঁড়ায় তন্ময়-হীরা-বাথালা-সুমন। জার্সিতে লেখা – উই ওয়ান্ট জাস্টিস ফর আরজি কর। একই কাণ্ড ডুরান্ড কাপের মোহনবাগান এবং বেঙ্গালুরু এফসি ম্যাচে। সেখানেও খেলা শেষে সবুজ-মেরুন সমর্থকেরা টিফো প্রদর্শন করে। তাতে লাল-হলুদ আর সবুজ-মেরুনে লেখা, "হাতে হাত রেখে এ লড়াই / আমাদের বোনের বিচার চাই"।

কি অদ্ভুত! ২০১১ সালে লড়াই করে ক্ষমতায় এসেছিলেন যিনি, আজ তাঁরই রাজত্বে বাঙাল-ঘটিকে জোট বেঁধে লড়াইয়ের কথা বলতে হচ্ছে, দেশের এক তরতাজা মহিলা ডাক্তারের নৃশংস খুনের বিরুদ্ধে। ১৪ অগাস্টের মধ্যরাত ছিল প্রতিবাদের শুরু। ১৮ অগাস্ট বাঙাল-ঘটির প্রতিরোধ। এর শেষ কোথায়? বলবে সময়। আসলে আজ আমরা যা দেখছি, আচমকা সেটা শুরু হয়নি। ২০১১ থেকে ২০২৪ – ১৩ বছর একটা বিরাট সময়। এই সময়ের মধ্যে একের পর এক খুন, ধর্ষণ, গণধর্ষণ, 'রেপ করে দেব' বলে হুমকি, পিঠে বানানোর জন্য বাড়ির মেয়ে-বউদের রাতের বেলা তৃণমূল পার্টি অফিসে ডেকে নিয়ে যাওয়া, ভোটের আগে পুলিশকে দিয়ে ভয় দেখানো এবং কেস দেওয়া, ভোট শেষ হলে নির্বিচারে বিরোধী দল বিজেপির লোকজনদের খুন-হুমকি-এলাকা ছাড়া করা, ছাত্র আন্দোলনে গুলি এবং ছাত্র মৃত্যু - এসব যখন দিনের পর দিন ঘটেছে তখন বিজেপি প্রতিবাদ করলেও সাধারণ মানুষ ভয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়নি। কিন্তু মনে মনে সমর্থন নিশ্চয়ই করেনি। ভিতরে ভিতরে হয়ত চুরমার হয়ে গেছে। চোয়াল শক্ত হয়েছে কিন্তু সরাসরি রাজ্যের প্রধান বিরোধী দলের পাশে এসে দাঁড়াতে পারেনি। কিন্তু নিঃশব্দে জোট বেঁধেছে বাঙাল-ঘটি-শহর-গ্রাম-মফস্বল। জোট বেঁধেছে উত্তরবঙ্গ-দক্ষিণবঙ্গ। সরাসরি তার ছায়া দেখা গেছে লোকসভা ভোটের ফলাফলে। স্পষ্ট বোঝা গেছে শহর এবং শহরের শিক্ষিতেরা আর পছন্দ করছে না তৃণমূলকে। মানে তৃণমূলের দাদাগিরি এবং হুমকি সরাসরি প্রত্যাখান করছে শহর। মফস্বলেও তার প্রতিফলন হয়েছে জোরালোভাবে। বেশীরভাগ বিধানসভায় তৃণমূলকে প্রত্যাখান করেছে মধ্যবিত্ত মানুষ কিন্তু তবুও জিতেছে তৃণমূল বাঁকা পথে বা ভয় দেখিয়ে। গ্রামে, বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গের গ্রামগুলিতে মহিলাদের কাছে ত্রাস তৃণমূল। একসময় ছিল সিপিএম। এই মহিলাদের ভোট তৃণমূলকে কাঙ্খিত জয় এনে দিলেও গ্রাম আসলে তাসের ঘরের মত দাঁড়িয়ে আছে। অনেকটা সন্দেশখালির মত। সময় এলেই ছারখার করে দিতে পারে তৃণমূলের সাজানো বাগান। এক-দুজন নয় অসংখ্য রেখা পাত্রেরা ওই গ্রামের মধ্যেই আছে যারা যে কোন সময় বিপুল প্রতিরোধে ভয় ভুলে রাস্তায় এসে দাঁড়াতে পারে যেমনটা সেদিন রাজপথে এসে দাঁড়িয়েছিল বাঙাল-ঘটির জোট।

নাট্যপাগল ব্যক্তিত্ব থেকে মহান ডাক্তার মানবদরদী রাধাগোবিন্দ কর

বিনয়ভূষণ দাশ

মৃত্যুর প্রায় ৬৬ বছর বাদে ডাঃ রাধাগোবিন্দ করের প্রতিষ্ঠিত আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল দুর্নীতি, ধর্ষণ ও ডাক্তারি ছাত্রী খুনে অভিযুক্ত। ডাঃ কর নিজে বেঁচে থাকলে তাঁর প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালের এই অবস্থা দেখলে কি বেদনা অনুভব করতেন তা ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়!

একেবারে সাম্প্রতিককালে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতে সংবাদের শিরোনামে উঠে এসেছে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল নাম। অবশ্য মানব কল্যাণের কোন নতুন উদ্ভাবনের কারণে নয়, এক নৃশংস ধর্ষণ ও হত্যার কারণে। এই বৎসরের ৯ আগস্ট এই হাসপাতাল চত্বরেই ইদানীংকালের সবচেয়ে নৃশংস ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনাটি ঘটেছে এক মহিলা ডাক্তারের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে; তাঁরই নিজের হাসপাতাল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। আর তারই জেরে সারা কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ আজ পথে নেমেছে দোষীদের শাস্তি ও মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবীতে।

অথচ, চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেছিলেন এক মহান মানবপ্রেমিক, আর্তের প্রতি নিবেদিত চিকিৎসক ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাস। সমগ্র কলকাতায় প্লেগ রোগ তখন মহামারীর রূপ নিয়েছে। বাগবাজার ও তৎসংলগ্ন উত্তর কলকাতায় অলিতে গলিতে ঘুরে ক্লান্তিহীনভাবে প্লেগরোগীদের সেবা করে চলেছেন এক আইরিশ ভদ্রমহিলা। প্রায় একই সময়ে টুপি পরিহিত এক বিলাতফেরত ডাক্তারও রোগীদের বাঁচাতে উত্তর কলকাতা চষে ফেলছেন। তাঁর সঙ্গে থাকত ওষুধভর্তি একটি ক্যাম্বিসের ব্যাগ। বিনা পারিশ্রমিকে তিনি রোগী দেখছেন শুধু তাই নয়, প্রয়োজনে তিনি রোগীদের পথ্য কেনার অর্থও দিচ্ছেন। ইতিমধ্যে সেই আইরিশ ভদ্রমহিলার সঙ্গেও

মানবদরদী ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর

তাঁর পরিচয় হয়। প্লেগের সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে তাঁরা দুজনে একসঙ্গে কাজ করতে শুরু করেন। উদ্দিষ্ট ডাক্তার হলেন প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর আর সেই আইরিশ ভদ্রমহিলা হলেন স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা, ভগিনী নিবেদিতা।

কে ছিলেন এই ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর ? হাওড়ার রামরাজাতলা স্টেশনের কাছে বেতড়-এ ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দের ২৩ আগস্ট এক বিখ্যাত চিকিৎসক পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ডাঃ দুর্গাদাস কর ঢাকার বিখ্যাত মিডফোরড হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন আর তাঁর ভাই ছিলেন প্রখ্যাত চিকিৎসক ও নাট্যব্যক্তিত্ব ডাঃ রাধামাধব কর। চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষায় তিনি বাংলায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেন। অথচ, তিনি হতে চেয়েছিলেন একজন নাট্যব্যক্তিত্ব। তিনি ও তাঁর ভাই রাধামাধব ১৮৭৩ সালের ২৯ মার্চ ন্যাশন্যাল থিয়েটারে অভিনয় করেন দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকে। তিনি নাটক রচনাও করেছেন। যাইহোক, এই উদ্যোগের পেছনে ছিলেন এক ইংরেজ ডাক্তার, চার্লস ম্যাকনামারা-র একটি ভাল চক্ষু হাসপাতাল গড়ার উদ্যোগ। নীলদর্পণ নাটকটি জনপ্রিয় হয় এবং ম্যাকনামারা তাঁর ইপ্সিত হাসপাতালটি স্থাপন করতে সক্ষম হন। ম্যাকনামারার এই উদ্যোগ রাধাগোবিন্দের মনে একটি হাসপাতাল স্থাপনের বাসনা বপন করে দেয়। তবে রাধাগোবিন্দ করের মত একজন বহুমুখী প্রতিভার বিস্তারিত কার্যকলাপ একটি প্রবন্ধের পরিসরে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই সংক্ষেপে তাঁর জীবনের কয়েকটি দিক তুলে ধরার চেষ্টা করব।

তিনি কলকাতার হেয়ার স্কুলে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন এবং সেখান থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু নানা কারণে তিনি এক বৎসর পড়েই পড়াশোনা ছেড়ে দেন। তিনি পরে আবার ওই কলেজেই ১৮৮০ সালে ভর্তি হন এবং ১৮৮৩ সালে মেডিক্যালে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। পরবর্তীকালে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য ইংল্যান্ডে পাড়ি দেন। সেখানে এডিনবারগ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে এম আর সি পি ডিগ্রী লাভ করেন। সেখানে তাঁর শিক্ষকদের উৎসাহপ্রদান সত্বেও তিনি ভারতে ফিরে আসেন এবং ভারতীয় নাগরিকদের জন্য একটি চিকিৎসা শিক্ষালয়, ন্যাশনাল মেডিকেল প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি দেশে ফিরে আসেন।

দেশে ফিরে ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের ১৮ অক্টোবর তিনি কলকাতার ডাক্তারদের একটি সভা আহ্বান করেন। ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন ডাঃ অক্ষয়কুমার দত্ত, ডাঃ মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ বিপিনবিহারী মৈত্র, ডাঃ এমএল দে, ডাঃ বিজি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডাঃ কুন্দন ভট্টাচার্যের মত তৎকালীন সব বিখ্যাত সব চিকিৎসকেরা। সেখানে উপস্থিত সকল চিকিৎসকই একমত হন যে, ভারতীয়দের প্রতি দায়বদ্ধ একটি হাসপাতাল তথা চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ভীষণ প্রয়োজন। ডাঃ আর জি করকে এই বিশাল কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি অপেক্ষাকৃত চিকিৎসা সুবিধাবঞ্চিত শ্যামবাজার, বেলগাছিয়া, দমদম ইত্যাদি অঞ্চলগুলি এজন্য বেছে নেন। তিনি নিজের বাই-সাইকেলে ওইসব অঞ্চলে গিয়ে রোগীদের চিকিৎসা করতেন। গুরুত্বপূর্ণ, প্রশংসনীয় ডিগ্রী থাকা সত্ত্বেও তিনি ওইসব অঞ্চলে কাজ করা পছন্দ করেছিলেন। আর এইসবের ফলশ্রুতি হিসেবে ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে ১৬১ বৈঠকখানা বাজার রোডের ভাড়া বাড়ীতে কলকাতা স্কুল অফ মেডিসিন গড়ে ওঠে । যদিও এর কিছুদিন পরেই ১১৭ বৌবাজার স্ট্রিটে স্থানান্তরিত হয় সেই স্কুল। ১৮৮৭ সালের আগস্ট মাসে স্কুলটির নাম পরিবর্তিত হয়ে ক্যালকাটা মেডিক্যাল স্কুলে পরিণত হয়। এই মেডিক্যাল স্কুলের সমস্ত কাজ বাংলায় হত, আর স্কুলটি সরকারী আওতাভুক্ত ছিল না বলে স্কুলের সব কর্মচারীই ছিলেন বাঙালী। ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে অন্য একটি প্রতিষ্ঠান, নীলরতন সরকারের প্রতিষ্ঠিত কলেজ অফ ফিজিসিয়ানস এন্ড সারজেন্স অফ বেঙ্গলের সাথে সংযুক্ত হয়। পরে এই হাসপাতালটি ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে আবার আলবার্ট ভিক্টর হাসপাতাল নামে পরিচিত হয় প্রিন্স আলবার্ট ভিক্টরের নামে। তিনি এই হাসপাতালটি পরিদর্শন করতে এসে তিনি ১৮ হাজার টাকা দান করেন। ১৯১৪ সালে এই হাসপাতালটি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনপ্রাপ্ত হয় এবং বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজ নামে পরিবর্তিত হয়। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের ৫ জুলাই এই কলেজের দ্বিতল ভবনের উদ্বোধন করেন লর্ড কারমাইকেল। ফলে, এটিই আবার লর্ড কারমাইকেলের সম্মানে কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ নামে নামাঙ্কিত হয় ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে। স্বাধীনতার পরে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে হাসপাতালটির নাম পরিবর্তিত হয়ে ডাঃ রাধাগোবিন্দ করের সম্মানে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ এন্ড হসপিটাল নামে পরিচিত হয়। বস্তুত, হাসপাতালটির নাম পরিবর্তনের এক দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। তবে, হাসপাতালটি ১৯৫৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অধিগ্রহণ করে; সেই থেকে এটি সরকারী হাসপাতাল হিসেবে পরিগণিত।

বাস্তবে এই হাসপাতালটির জন্য জমি ও অর্থ যোগাড়ের জন্য ডাঃ করকে বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। আর এজন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে কোলকাতার ধনী ব্যক্তিদের দুয়ারে দুয়ারে এবং রাস্তায় রাস্তায় আক্ষরিক অর্থেই ভিক্ষা করে বেড়িয়েছেন। এইভাবে এবং তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করে তিনি প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাড় করেন। এই অর্থ থেকে তিনি বেলগাছিয়া অঞ্চলে চব্বিশ হাজার টাকায় ১২ বিঘা (চার একর) জমি ক্রয় করেন প্রস্তাবিত হাসপাতালের জন্য। খরিদকৃত এই জমিতে তিনি এক বিশাল হাসপাতাল নির্মাণ করেন সত্তর হাজার টাকায়। ঠিকানা ১ নং বেলগাছিয়া রোড। প্রাথমিকভাবে ৩০ শয্যাযুক্ত হাসপাতালটি তার যাত্রা শুরু করে। ডাঃ কর তাঁর ইংরাজি ভাষায় শিক্ষার ফলে সব ধরণের সুযোগই পেতেন সেই আমলে। কিন্তু তাঁর স্বদেশপ্রেম ও স্বজাত্যবোধ তাঁকে গরীব ও সাধারণ মানুষের ডাক্তারে রূপান্তরিত করেছিল।

শুধু তাই নয়, বাংলাভাষায় ডাক্তারি পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তিনি বাংলা ভাষায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের পুস্তক লিখতে শুরু করেন যাতে করে বাঙালি ছাত্ররা সহজে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে পারে। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রথম চিকিৎসা শাস্ত্রের পুস্তক, 'ভিষগবন্ধু' পুস্তক প্রকাশিত হয়। তারপরে ক্রমান্বয়ে লিখেছেন ' ধাত্রীসহায়', ' সংক্ষিপ্ত তত্ব' , 'গাইনিকলজি', 'সংক্ষিপ্ত শারীরতত্ব' , 'রোগী পরিচর্যা' , ' প্লেগ' ইত্যাদি অনেক পুস্তক। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের আত্মজীবনী 'লাইফ এন্ড এক্সপেরিয়েন্সেস অফ আ বেঙ্গলি কেমিস্ট' নামের পুস্তক থেকে জানা যায়, দেশের প্রথম ভারতীয় ওষুধ তৈরির কারখানা, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত 'বেঙ্গল কেমিক্যালস এন্ড ফার্মাসিওটিক্যালস লিমিটেড'-এ (১৯০১) দেশীয় পদ্ধতিতে ঔষধ তৈরিতে ডাঃ রাধাগোবিন্দ করের বিশেষ অবদান রয়েছে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত এই হাসপাতালের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে যুক্ত ছিলেন অনেক প্রখ্যাত চিকিৎসকগণ। কয়েকজনের নাম করা প্রাসঙ্গিক বলেই মনে করি। তাঁরা হলেন ডাঃ মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, লেফটেন্যান্ট কর্নেল সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী, স্যার কৈলাসচন্দ্র বসু, ডাঃ নীলরতন সরকার, ডাঃ কেদারনাথ দাস এবং স্বয়ং ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর। এদের মধ্যে লেফটেন্যান্ট কর্নেল সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী, ডাঃ কৈলাসচন্দ্র বসু এবং ডাঃ নীলরতন সরকার পরপর এই কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে ডাঃ মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাঃ কেদারনাথ দাসও অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর স্বয়ং কখনও অধ্যক্ষ হননি। উল্লেখ্য যে, এদের সকলেই প্রথম থেকেই এই কলেজের সাথে যুক্ত ছিলেন।

ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ১৯ ডিসেম্বর মাত্র ৬৬ বৎসর বয়সে ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়ে স্বর্গত হন। তাঁর দেহান্তরের সময় নিজের বলতে কিছু ব্যক্তিগত জিনিসপত্র ছিল মাত্র, বাকি সবই তিনি মেডিক্যাল কলেজের জন্য দান করে গেছেন, এমনকি তাঁর বসতবাড়ীটিও।

প্রায় ৬৬ বৎসর পরে ডাঃ রাধাগোবিন্দ করের প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালটি দুর্নীতি, ধর্ষণ ও ডাক্তারি ছাত্রী খুনে অভিযুক্ত। আজকের দিনে হাসপাতালটির গৌরবমণ্ডিত অতীত স্মরণ করলে বর্তমানের এই অভিযোগ জর্জরিত অবস্থা কল্পনা করাও ভীষণ শক্ত। ডাঃ কর নিজে বেঁচে থাকলে তাঁর প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালের এই অবস্থা দেখলে কি বেদনা অনুভব করতেন তা ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়!

অভয়ার বিচার ও মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে

লাগাতার আন্দোলনে বিজেপি

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

ভয় দেখিয়ে থামানো যাবেনা এই আন্দোলন। সু-প্রতিম বচনে নজর ঘোরানো যাবেনা এই আন্দোলনের। অর্থহীন আলাপনে ভুলবে না মানুষ। অভয়াকে যারা খুন করেছে এবং খুনীদের আড়াল করার চেষ্টা করেছে, তাদের যতক্ষণ না কঠোর শাস্তি হচ্ছে এবং মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ না করছেন ততক্ষণ চলবে ভারতীয় জনতা পার্টির এই মাটি কামড়ানো লড়াই।

আরজি কর হাসপাতালে তরুণী শিক্ষানবিশ ডাক্তারের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় প্রথম দিন থেকেই আন্দোলনে নেমেছে বঙ্গ বিজেপি। অপদার্থ মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবীতে শ্যামবাজারের ধর্না মঞ্চ থেকেই রাজ্যে প্রশাসনের ব্যর্থতা নিয়ে সরব হয়েছেন নেতারা। আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে ধারাবাহিক ভাবে পথে নামার কথা আগেই ঘোষণা করেছিলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। এরই মধ্যে ২২ অগাস্ট বিজেপির স্বাস্থ্য ভবন অভিযানে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় বিধাননগর। ঠিক তার পরের দিন রাজ্যজুড়ে থানা ঘেরাও করেন বিজেপি কর্মীরা। অভয়ার বিচার ও মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে বিজেপির এই লাগাতার কর্মসূতিগুলিতে ব্যাপক ভিড় প্রমাণ করছে যে পশ্চিমবঙ্গে স্বৈরাচারী শাসনের সমাপ্তি সময়ের অপেক্ষামাত্র।

শ্যামবাজারে পাঁচ মাথার মোড়ে ধর্না

আরজি কর হাসপাতালের অদূরে শ্যামবাজারে পাঁচ মাথার মোড়ে বিজেপির ধর্না কর্মসূচিতে পুলিশ প্রথমে অনুমতি দেয়নি। এরপর হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে হয় দলকে। শ্যামবাজারে বিজেপিকে ধর্না কর্মসূচির অনুমতি দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। এরপরই ধর্না স্থল পরিদর্শন করেন বিজেপি নেতৃত্ব। সুকান্তবাবুর কথায়, "স্বাস্থ্য ভবন হল ঘুঘুর বাসা। তাই এই প্রতিবাদ। অবিলম্বে আসল অপরাধীদের গ্রেফতার করার দাবি জানাচ্ছে বিজেপি। পুলিশ এবং আরজিকর প্রশাসনের কর্তাদের মধ্যে টেলিফোনিক কথাবার্তায় নজর দিক সিবিআই, তাহলেই সত্যি সামনে আসবে।" রাজ্য সভাপতি আরও জানিয়েছেন, "দেশের শীর্ষ আদালতের নির্দেশ থেকে স্পষ্ট রাজ্যের পুলিশ-প্রশাসনের উপর সুপ্রিম কোর্টের আস্থা নেই। আরজি কর-এর নিরাপত্তার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় বাহিনীকে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। নারী নিরাপত্তার ইস্যুতে উত্তাল রাজ্য।"

২২ অগাস্ট স্বাস্থ্য ভবন অভিযান

২২ অগাস্ট আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে স্বাস্থ্য ভবন অভিযান কর্মসূচিতে বিজেপির মিছিলকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয় সল্টলেকে। হিডকো

থেকে শুরু হওয়া বিজেপির মিছিলের গন্তব্য ছিল স্বাস্থ্য ভবন। মিছিলে পা মেলান সুকান্ত মজুমদার, শুভেন্দু অধিকারী, দিলীপ ঘোষ, অর্জুন সিং, অগ্নিমিত্রা পল, লকেট চট্টোপাধ্যায়, দেবশ্রী চৌধুরী, রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, রুদ্রনীল ঘোষ, হিরণ চট্টোপাধ্যায়রা। মিছিল কিছুটা এগোতেই স্বাস্থ্য ভবনের ৪ কিলোমিটার আগেই বিজেপি কর্মীদের পুলিশ বাধা দেয়। ফলে, পুলিশের সঙ্গে তাদের ধস্তাধস্তি হয়।

ব্যারিকেড ভেঙে বিজেপি কর্মীরা স্বাস্থ্য ভবনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। এরই মাঝে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়কে একটি প্রিজন ভ্যানে পুলিশ তুলে নেয়। এই ঘটনায় নতুন করে উত্তেজনা দেখা দেয়। ওই ভ্যানও আটকে দেন ক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মীরা।

অন্যদিকে, মিছিল নিয়ে এগোতে থাকলে অর্জুন সিং সহ বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে পুলিশ কর্মীদের দফায় দফায় ধস্তাধস্তি হয়। এদিন বিজেপি কর্মীদের প্রবল বিক্ষোভের সামনে পুলিশকে অনেক সময়ই অসহায় মনে হয়েছে। তারা লাঠি উঁচিয়ে বার বার তেড়ে গেলেও একরোখা বিজেপি কর্মীদের মনোবলে এতটুকু চিড় ধরাতে পারেনি।

এর পরে বিজেপি সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যকে পুলিশ আটক করে। তবে সুকান্ত মজুমদার পতাকা নিয়ে এগিয়ে যান। সঙ্গে ছিলেন প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষও। শমীক ভট্টাচার্যকে তোলার সময়ে সুকান্ত মজুমদারকেও গ্রেফতার করতে চায় পুলিশ। তবে, সেই সময় কর্মীরা ছিনিয়ে নেন রাজ্য সভাপতিকে।

ঘটনার পর পরই সুকান্ত মজুমদার বলেন, "বাংলায় যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তার একমাত্র সমাধান মুখ্যমন্ত্রীর ইস্তফা। আর পুলিশ কমিশনারকে বরখাস্ত করতে হবে। সেই দাবিতেই এই অভিযান। বিচার না-পাওয়া পর্যন্ত পথেই থাকবে বিজেপি।"

২৩ অগাস্ট রাজ্যজুড়ে থানা ঘেরাও

আরজি কর ইস্যুতে ২৩ অগাস্ট রাজ্যজুড়ে থানা ঘেরাওয়ের ডাক দেয় বিজেপি। রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার স্বাস্থ্য ভবন অভিযানের পর এই কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন। রাজ্যের সর্বত্র বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা থানার সামনে বিক্ষোভ দেখান। অনেক জায়গায় পুলিশ বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয়।

থানা ঘেরাওয়ের কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা দেখা দেয় নন্দীগ্রামে। পুলিশের তরফে বলা হয়েছিল, তারা একটি নির্দিষ্ট প্রতিনিধি দলকে থানায় প্রবেশের অনুমতি দেবে। কিন্তু বিজেপি কর্মীদের দাবি ছিল, তাঁরা সকলেই থানার ভিতরে ঢুকবেন। এরপর নন্দীগ্রাম থানার গেটের কাছে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের পুলিশ আটকে দেয়। তারপরই শুরু হয় পুলিশের সঙ্গে বিজেপি কর্মীদের তুমুল বচসা। পুলিশের সঙ্গে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন বিজেপি কর্মীদের একাংশ। পরে বিজেপি কর্মীরা মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে নন্দীগ্রাম থানার সামনে বিক্ষোভও দেখান। পরে অবশ্য বিজেপির একটি প্রতিনিধিদল থানায় ডেপুটেশন জমা দেয়।

অন্যদিকে ঘোলা থানায় বিজেপির কর্মসূচি ছিল। সেই কর্মসূচিতে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী যোগ দেন। বিজেপি কর্মীদের আটকাতে থানার অনেকটা আগে পুলিশ ব্যারিকেড তৈরি করে। কিন্তু, বিজেপি কর্মীরা ব্যারিকেড ভেঙে থানার দিকে এগিয়ে যান। আরজি কর কাণ্ড নিয়ে রাজ্য সরকারকে তোপ দাগেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

মেদিনীপুরে বিজেপির থানা ঘেরাও কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিলেন দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। যদিও শেষ পর্যন্ত থানা ঘেরাও না করে বিক্ষোভ মিছিল করে বিজেপি। নন্দীগ্রাম, ঘোলা, মেদিনীপুরের পাশাপাশি কাঁকসা থানা ঘেরাও করে বিজেপি। কাঁকসার হাটতলা থেকে মিছিল করে আসে বিজেপি কর্মীরা, থানার সামনে বিক্ষোভ দেখান। থানায় ঢুকে ডেপুটেশন জমা দেয়।

মাথাভাঙ্গা থানা ঘেরাও নিয়ে উত্তেজনা দেখা দেয়। পুলিশ-বিজেপি কর্মীদের মধ্যে ধস্তাধস্তি হয়। মাটিগাড়ায় বিজেপি থানা ঘেরাও করে। থানার সামনে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মীরা। কৃষ্ণনগরের কোতোয়ালি থানার সামনে বিজেপি কর্মীরা বিক্ষোভ দেখান। চুঁচুড়া ঘড়ির মোড় থেকে মিছিল করে চুঁচুড়া থানার সামনে বিজেপি কর্মীরা যেতেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি বেধে যায়। পশ্চিম বর্ধমানের বারাবানি থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি কর্মীরা। অন্য দিকে, আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে বীরভূমের সিউড়ির চৈতালি মোড়ে লাগাতার অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করে বিজেপি। নেতৃত্বে ছিলেন বীরভূম সাংগঠনিক জেলার সভাপতি ধ্রুব সাহা।

জাস্টিস ফর আরজি কর

দফা এক দাবি এক, মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ

সাহানা মুখোপাধ্যায়

কার্শিয়াং থেকে কাকদ্বীপ কিংবা পুরুলিয়া থেকে পাথরপ্রতিমা বা পার্কস্ট্রিট, বগটুই, কামদুনি, হাঁসখালি ইত্যাদি পঃবঙ্গের সমস্ত জেলায় অভয়ার মতো এমন নারীমেধ যজ্ঞ ক্রমাগত হয়েই চলেছে। কিন্তু আগাগোড়া মুখ্যমন্ত্রীর হাবভাব ও কথাবার্তা শুনে মনে হয় না তিনি বিন্দুমাত্র লজ্জিত।

"তুই কি আমার বোন?
তুমি আমার মা?
মুখে নখের আঁচড় কেন—উদলা কেন গা ?
গিয়েছিলাম বনে,
বনে ছিল কালকেউটে কামড়াল নির্জনে।
পুতের মত ভায়ের মত পাঁচটি সোনার ছা
আশ মিটিয়ে মাস খেয়েছে উদলা করে গা।"

— কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তার আদরের ছোটো-ছোটো "সোনার ছা"-য়েদের সৌজন্যে পঃবঙ্গের কন্যাশ্রীদের হাল এখন এমনটাই। যে ভাবমূর্তি সম্বল করে একদা ২০১১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নবান্নে ১৪ তলায় আসীন হয়েছিলেন, আর জি করের তরুণী চিকিৎসকের ওই নারকীয় মৃত্যুতে মানুষ এখন তাঁকে সেখান থেকে টেনে হিঁচড়ে নামাতে প্রস্তুত। অথচ রাজ্যবাসী তাকে মা-মাটি-মানষের রক্ষাকর্ত্রী হিসেবে পেতে চেয়েছিল। তিনিও শপথ নিয়েছিলেন দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করবেন - এই প্রতিশ্রুতিতে। কিন্তু বাস্তবে হয়েছে ঠিক তার উল্টো। মুখ্যমন্ত্রী দু'চোখ বন্ধ করে দুষ্টের পালক হয়ে রয়ে গেলেন তার রাজত্বের গোড়া থেকে। 'গুন্ডা কন্ট্রোল' করে দশ বছরে পুরো রাজ্যটাকে গুন্ডাদের হাতে সঁপে, বলা ভালো, বিক্রি করে দিয়েছেন। আর জি কর কাণ্ড তার টাটকা প্রমাণ।

হাসপাতালের মধ্যেই ৩১ বছরের শিক্ষানবিশ এক ডাক্তার ছাত্রীকে নৃশংসভাবে ধর্ষণ ও হত্যা করা হয়েছে। এমন বিভৎস নারকীয় ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, পুলিশ ও তৃণমূল সরকারের স্বাস্থ্যভবনের ষড়যন্ত্র জনসমক্ষে এসেছে। ঘটনা পরম্পরা ও চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের বক্তব্যে বুঝতে অসুবিধা হয় না, একাধিক ব্যক্তির পরিকল্পিত যোগসাজসে খোদ সরকারি হাসপাতালে এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিলেন ছাত্রীটি। অথচ আর জি কর ছিল তার সেকেন্ড হোম বা কর্মস্থল। একটানা ৩৬ ঘন্টা তিনি রোগী পরিষেবা দিয়ে রাতে বিশ্রামের জন্য গিয়েছিলেন সেমিনার রুমে বা তৎসংলগ্ন কোনও ঘরে। সেখানেই তার দু'চোখ ফুঁড়ে রক্তধারা গড়িয়েছে।

কেবল আর জি কর নয়। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের মদতে মাফিয়াদের স্বর্গরাজ্য। কোনওটাই যে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর অগোচরে ঘটে চলে, তেমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই। কারণ, লাভের গুড় জমা হয় তৃণমূলের দলীয় কোষাগারে। দলটাই যে চলে দুর্নীতিগ্রস্তদের চুরির টাকায় ও পৃষ্ঠপোষকতায়। তাই কোনও ঘটনা থেকেই মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষা নেননি। যখন কোথাও নারী নির্যাতন ঘটে, রাজ্য পরিচালনায় শুধরে নেওয়ার পরিবর্তে পুলিশ দিয়ে রাজ্যে ভয় ও আতঙ্কের পরিবেশ পরিস্থিতি জিইয়ে রেখে সৃষ্টি সুখের উল্লাসে তিনি সিন্থেসাইজার বাজান। সমস্ত ক্ষেত্রে দুষ্কৃতীদের সব ক'টি অপরাধকে তিনি আড়াল করতে চেয়েছেন, "মাস্টারমশাই আপনি কিছুই দেখেননি" মার্কা প্রলাপনে। ফলস্বরূপ, ধর্ষণের মতো অপরাধের পরেও ধর্ষক বীরদর্পে দাপিয়ে বেড়াতে সাহস পায়। এরকম দাগী অপরাধীদের পুলিশ খুঁজে পায় না। সন্দেশখালির ত্রাস মুখ্যমন্ত্রীর পেয়ারের শাহজাহানের মতো। নেপথ্যের কারণ, অপরাধ সেরে তারা সটকে পড়ে পুলিশ ও তৃণমূল দলের প্রশ্রয় ও নিরাপদ আশ্রয়ে। এমন সেঁধিয়ে যায় যে মমতার পুলিশ আর তাদের খুঁজে পায় না।

কিন্তু ঢের হয়েছে। এবার জনগণের সহ্যের বাঁধ ভেঙেছে। বারে বারে ঘুঘু ধান খেয়ে গেলেও এইবার পড়েছে ফাঁদে। ফলত, নারী সুরক্ষায় মমতার সরকারের উপরে পশ্চিমবঙ্গবাসীর মনে ভরসার পরিবর্তে এক দুর্দমনীয় অনাস্থা দানা বেঁধেছে। যা জাস্টিস ফর আর জি কর স্লোগান তুলে সব বাধা ভয়কে দূরে সরিয়ে রে রে করে তেড়ে যেতে চাইছে নবান্ন অভিমুখে। পরিস্থিতি এমনই পর্যায়ে চলে গিয়েছে, তৃণমূলের নেতাদের দেখলে মানুষ এখন লাঠ্যৌষধি প্রয়োগে বেদম উত্তম-মধ্যম দাওয়াই দিতে শুরু করেছে। প্রতিবাদ, আন্দোলনে যেকোনও মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রীর গদি টলমল করতে পারে। যতদিন যাবে এর তীব্রতা অধিকতর হবে। কারণ, আর জি করের অভয়ার মধ্যে মানুষ খুঁজে পেয়েছে নিজের বাড়ির কন্যাকে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্বোপরি মুখ্যমন্ত্রী ও সেনাপতি ভাইপো নাকি এ রাজ্যের পাহারাদার। তাহলে আর জি কর ও সরকারি হাসপাতালগুলিতে মেয়েদের নিরাপত্তা কোথায়? হাসপাতালে কর্মরত মহিলা চিকিৎসক, নার্সদের নিরাপত্তাজনিত খবর স্বাস্থ্যভবন রাখবে না? কেন সমস্ত ব্যবস্থাপনা তলানিতে পৌঁছেছে? জবাব নেই সরকার বা তৃণমূল দলের কারও কাছে। তৃণমূল আমলে প্রত্যেকটি হাসপাতাল যে ঘুঘুর বাসা, তা মুখ্যমন্ত্রীও ভালোভাবেই জানেন।

আর জি করের প্রাক্তন ডেপুটি অধ্যক্ষ আখতার আলির মতে "সন্দীপ ঘোষ আসার

আগে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ইস্টার্ন ইন্ডিয়ায় ১ নম্বর মেডিক্যাল কলেজ ছিল। আমি পাঁচ জন প্রিন্সিপ্যাল ৬ জন মেডিক্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট, ভাইস প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে কাজ করেছি। কিন্তু ওর মতো নোংরা লোক আমি দেখিনি। সে ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসের পর থেকেই নোংরা রূপ দেখাতে শুরু করেন সন্দীপ। ছাত্রদের ফেল করিয়ে টাকা তোলা, অঙ্গ পাচারের মতো মারাত্মক ১০টি অভিযোগ হাসপাতালের ভিজিলেন্স কমিশনে জমা করেছিলেন। কিন্তু অধ্যক্ষের কেশাগ্র কেউ স্পর্শ করতে পারেনি"। আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত আর জি করের অধ্যক্ষর দিকে তার সহকর্মী চিকিৎসকেরাও আঙুল তুলেছেন। এহেন সন্দীপের কুকীর্তি জেনেও স্বাস্থ্যমন্ত্রী তার বিরুদ্ধে ওঠা হাসপাতাল চত্বরে বেআইনি কার্যকলাপে তদন্তের নির্দেশ না দিয়ে সন্দীপের পক্ষে সাফাই গেয়েছেন। মেডিক্যাল কলেজগুলির ডাক্তার, ছাত্র ছাত্রীদের চাপের গুঁতোয় তিনি সন্দীপকে সেখান থেকে অধ্যক্ষের পদ থেকে সরিয়ে নেন ঠিকই। কিন্তু তিন ঘন্টার মধ্যে আরও এক বড় হাসপাতালের অধ্যক্ষ হিসেবে ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। আসলে প্রাক্তন অধ্যক্ষকে না বাঁচিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর উপায় নেই । যদি সে মুখ খোলে? তাহলে তো রেহাই পাবেন না স্বাস্থ্যমন্ত্রীও। শিক্ষাদপ্তরের মতো গোটা স্বাস্থ্যভবনের ঢাকি সমেত বিসর্জন হয়ে যেতে পারে।

সর্বত্র তার মিথ্যার বেসাতি। লোক দেখাতে তিনি গিয়েছিলেন অভয়ার পিতা-মাতাকে নকল শোক জ্ঞাপন করতে। ১০লাখ টাকার অফারও করে এসেছেন মুখবন্ধ রাখার জন্য। মিডিয়ার সামনে যেন তাঁরা মুখ না খোলেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দ্বিচারিতায় পঃবঙ্গের মানুষ ক্লান্ত ও বিরক্ত। সঙ্গে তার প্রতি হাজার টন ঘৃণা। ন্যক্কারজনক ঘটনার পরদিন তিনি নিজেকে মহান সাজাতে বলেছিলেন, সারা রাত নাকি ফোনে ট্র্যাক রেখেছিলেন প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের সঙ্গে। এখন প্রশ্ন, নিয়ম না থাকা সত্ত্বেও সন্ধের পর ময়নাতদন্ত এবং সাত তাড়াতাড়ি দেহ দাহ করবার নির্দেশ কে দিয়েছিল? একদিকে দোষীর ফাঁসির দাবিতে চ্যালা-চামুণ্ডাদের নিয়ে পথে নামছেন। অন্যদিকে, তিনি কোটি কোটি অর্থ ব্যয়ে কপিল সিব্বলদের রাজ্য সরকারের হয়ে মামলা লড়বার জন্য নিয়োগ করছেন। যাতে সন্দীপ ঘোষের সাজা না হয়। তার সরকারের গায়ে কলঙ্কের আঁচড়টি না লাগে। কিন্তু রাজ্যের মানুষ তাঁকে আর কণামাত্র

বিশ্বাস করে না। তার সততা নিয়ে মানুষের মনে বারে বারে প্রশ্ন উঠেছে।

৯ আগস্টের পর থেকে এখনও পঃবঙ্গ জুড়ে ডাক্তার, ডাক্তারি পাঠরত ছাত্র-ছাত্রী, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী ও সাধারণ মানুষের বিদ্রোহের আগুন। স্বাস্থ্যব্যবস্থায় জড়িত মানুষজন ছাড়াও অন্য পেশার, নানা সংগঠন, এমনকী সরকারি স্কুল শিক্ষক-শিক্ষিকা, পড়ুয়াদের মনও নাড়িয়ে দিয়েছে আর জি করের মর্মান্তিকতা। সরকারি-বেসরকারি কলেজের অধ্যাপক, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানীরাও সরকারি হাসপাতালগুলির পচা-গলা স্বাস্থ্যব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে অভয়ার মৃত্যুর সঠিক বিচারের দাবিতে পথে নামতে বাধ্য হয়েছে। রাজপথ থেকে গলিপথ অতিক্রম করে তার আঁচ গোটা দেশে। বিদেশেও। অভয়ার বিচারের দাবিতে প্রতিবাদ, মিছিল উই ওয়ান্ট জাস্টিস।

মেয়েদের রাত দখলের স্বতস্ফূর্ত অভিযানের সাফল্য গুড়িয়ে দিতে আর জি করের মধ্যে দুষ্কৃতী ঢুকিয়ে দিয়েছে তৃণমূল বাহিনী। কিন্তু এভাবে কোনও গণআন্দোলন রোখা অতীতেও যায়নি। এখনও যাবে না। জনরোষ এবং ছাত্রসমাজের অরাজনৈতিক নবান্ন অভিযানের কর্মসূচীতে মমতা ব্যানার্জির হাঁটুও কাঁপিয়ে দিয়েছে। পুলিশ লেলিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ভয় দেখানো এবং শায়েস্তা করবার পরিকল্পনাও শুরু হয়েছে ইতিমধ্যে। মমতার প্রশাসন প্রচণ্ড চাপে রয়েছে। তৃণমূল দলের একইসঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর অনর্গল মিথ্যাচার, আর জি করের অধ্যক্ষের পক্ষ নিয়ে সাফাই এবং একের পর এক শাক দিয়ে মাছ ঢাকার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে মাটি কাঁপছে প্রতিবাদের দাপটে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চেয়ে তার বিরাট কাট আউট ছবিতে জুতোর মালা পরিয়ে মিছিলে হাঁটছে অগণিত মানুষ। কুকীর্তির প্রমাণ লোপাটে রাতারাতি সেমিনার হলের দেওয়াল ভেঙে ফেলা এবং সন্দীপ ঘোষের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, সর্বোপরি রাত দখলের কর্মসূচিতে গুন্ডাবাহিনীর তান্ডব, অগ্নি সংযোগ, ভাঙচুর মানুষের রোষের আগুনে ঘি নিক্ষেপ করেছে।

দু'দশকের বেশি সময় মানুষ তৃণমূল দল ও পুলিশমন্ত্রীর ধোঁকাবাজি সহ্য করেছে। কিন্তু আর জি কর কাণ্ডের পর মানুষ "ধন্য আশা কুহকিনী"র মতো তার ছলনায় আর ভুলছে না।

চিকিৎসকের এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর দায় কি মুখ্যমন্ত্রী এড়াতে পারেন? আমরা যদি তৃণমূল নেত্রীর রাজনৈতিক পরিক্রমা পর্যালোচনা করি, তাহলে দেখি এক ধ্বংসাত্মক রাজনীতি তিনি পছন্দ করেন। একের পর একে মিথ্যাশ্রয়ী পদক্ষেপ নিয়েছেন তিনি। আর বিপদ বুঝলেই যা লাগে দেবে গৌরীসেন অর্থাৎ জনগণের করের টাকায় সুপ্রিম কোর্টে দামি উকিল নিয়োগ। দেশের আর কোনও মুখ্যমন্ত্রীকে এতবড় নির্লজ্জ হতে দেখা যায়নি। ওনার ক্ষমতার লোভ এতটাই যে নবান্নের চোদ্দোতলার চেয়ার তিনি ছাড়তে চাইছেন না। তৃণমূলের কথাতেই বলতে হয় "দেহত্যাগ না করলে পদত্যাগ করবে না"--- এই ফর্মুলায় চলছেন তিনি। সামান্যতম মনুষ্যত্বের ত্বক শরীরে থাকলে এই ঘটনার পর চরম ব্যর্থতায় দায় ঘাড়ে নিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিতেন। মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টারের অর্থ, দলীয় তহবিল কোথা থেকে আসবে? তা তিনি আদায় করেন স্বাস্থ্য মাফিয়া, শিক্ষা মাফিয়া, খাদ্য মাফিয়ার মতো দুর্নীতিবাজ মাসলম্যানদের তোলাবাজি ও মস্তানি থেকে।

তবে এখন পুলিশ ও পুলিশমন্ত্রী রীতিমতো ভয় পাচ্ছেন। কারণ, বিদ্রোহ, আজ বিদ্রোহ চারিদিকে। তৃণমূলের অন্দরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, শুভচেতনাসম্পন্ন নেতা-নেত্রীরাও আজ বিদ্রোহ করতে শুরু করেছেন আর জি কর কাণ্ডে। পুলিশমন্ত্রীর পতন চেয়ে ভয়াবহ রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো ভেঙে বেরিয়ে আসতে চাইছেন তাঁরা। পুলিশ ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী সঞ্জয় রাইকে বলির পাঁঠা করে জবাই করতে চাইছে। কিন্তু এর শিকড় অনেক গভীরে। অভয়ার মৃত্যুর ঘটনা পরম্পরা বিশ্লেষণ করলে তারই ইঙ্গিত দেয়। মৃত্যুর কারণ প্রথমে সুইসাইড বলা, সন্ধের পর ময়না তদন্ত, তড়িঘড়ি মৃতদেহ দাহ ইত্যাদি আর জি করের অধ্যক্ষের লুকোচাপায় নারী-পুরুষ সকলেই উন্মত্ত বাঘের মতো আর জি কর ঘটনায় ক্ষিপ্ত। মমতার সরকার এই প্রথম ভয়ংকর রকম ভীত হয়ে পড়েছে। গদিচ্যুত হওয়ার ভয়ে। ডি আই-এর মাধ্যমে ফতোয়া জারি করে বার্তা দিয়েছে যে, কোনও স্কুলের ছেলে-মেয়েরা স্কুলের বাইরে কোনও আন্দোলনে অংশ নিতে পারবে না। কিন্তু কোনও নির্দেশ আর কাজে লাগছে না।

মাননীয় রাজ্যপাল থেকে সমাজের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ আইনশৃঙ্খলার রাশ পুলিশের হাতে রাখতে চাইছেন না। তাঁদের মতে পঃবঙ্গে ৩৫৫ ধারা লাগু হোক। কারণ, আর জি করের নৃশংসতা এখন আর কারওর ব্যক্তিগত নেই। গোটা রাজ্যের মেয়েদের মুখ হয়ে উঠেছে অভয়া। ঠিক মতো সি বি আই তদন্ত হলে শিক্ষা ও খাদ্য কেলেঙ্কারির মতো আরেকটা ব্যাপক দুর্নীতি ধরা পড়বে। সন্দীপ ঘোষ থেকে পুলিশ কমিশনার - পলিগ্রাফ টেস্ট হলে তাঁদেরও জেলে যেতে হতে পারে।অনেকে আবার খোদ মমতা ব্যানার্জির লাই ডিটেকটর টেস্টের দাবি করছে।

আর জি কর প্রসঙ্গে তৃণমূল দলও দ্বিধা বিভক্ত। দলের অন্দরে ডাক্তারদের মধ্যেও যেমন আওয়াজ উঠেছে সন্দীপ ঘোষের শাস্তির দাবিতে, তেমনই স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর অপসারণের জন্যও। রাজ্যের মানুষও মমতা ব্যানার্জির যেকোনও কথার বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তার পুলিশের প্রতি ভরসা কোন তলানিতে পৌঁছোলে রাজ্যবাসী তাঁকে ধিক্কার জানিয়ে পদত্যাগ চাইছে। আর স্বয়ং অধ্যক্ষকে পথে দেখামাত্র ধাওয়া করছে জনতা। রাজ্যের সর্বত্র সর্বস্তরে তাই আওয়াজ উঠেছে জাস্টিস ফর আর জি কর। আর দফা এক, দাবি এক। মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ।

ছবিতে খবর

রাজ্যে মহিলাদের উপর ক্রমাগত অত্যাচার এবং আরজি কর হাসপাতালে নির্যাতিতার বিচারের দাবিতে বিজেপির ডাকে ধর্মতলায় ধর্না অবস্থান।

নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, খুন, মহিলাদের অসুরক্ষা নিয়ে চুপ থাকায় পঃবঃ বিজেপি মহিলা মোর্চার নেতৃত্বে 'মহিলা কমিশনে তালা বন্ধ অভিযান'।

ছাত্রদের উপর নবান্ন অভিযানে পুলিশি জুলুম এবং রাজ্যের মহিলাদের অসুরক্ষা ও আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে বিজেপির ডাকা ১২ ঘন্টার সর্বাত্মক বাংলা বনধ।

ছাত্র আন্দোলনে পুলিশের হাতে আটক আন্দোলনকারীদের মুক্তির দাবিতে লালবাজারে পুলিশের আক্রমণের মুখে বিজেপি নেতৃত্ব এবং কর্মীরা।

আরজি কর কান্ডের প্রতিবাদে কলেজ স্কোয়ার থেকে আরজি কর - বিজেপির ধিক্কার মিছিল, অবস্থান-বিক্ষোভ

ভারতীয় জনতা পার্টি ওবিসি মোর্চা বর্ধিত প্রদেশ কার্যকারিণী বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তী সহ বিজেপি নেতৃত্ব।

পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির তফসিলি মোর্চার রাজ্য পদাধিকারী বৈঠকে রাজ্য সহ-সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) সতীশ ধন্ড জী, তফসিলি মোর্চার রাজ্য সভাপতি সুদীপ দাস এবং বিধায়িকা চন্দনা বাউরি

হাওড়া গ্রামীণ সাংগঠনিক জেলায় বর্ধিত কার্যকারিণী বৈঠকে রাজ্য সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তী সহ জেলা নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দ

উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলার বর্ধিত জেলা কার্যকারিণী বৈঠকে বিজেপি রাজ্য সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তী সহ জেলা নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দ।

দক্ষিন দিনাজপুর সাংগঠনিক বর্ধিত জেলা কার্যকারিণী বৈঠকে বিজেপি বিধায়কগণ, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তী সহ জেলা নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দ

ছবিতে খবর

আরজি কর কান্ডের প্রতিবাদ এবং মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে শ্যামবাজারে আন্দোলনকারী রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার সহ বিজেপি কর্মীরা গ্রেফতার।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপালের সঙ্গে বাংলায় নারী নিরাপত্তা নিয়ে বিশেষ আলোচনায় বিজেপি মহিলা মোর্চার প্রতিনিধি দল।

আরজি কর কান্ডে দোষীদের শাস্তির দাবিতে এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে বিধানসভায় বিজেপি পরিষদীয় দলের অবস্থান বিক্ষোভ।

আরজি কর কান্ডে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে শ্যামবাজারে বিজেপির ধর্না অবস্থান থেকে পুলিশ একের পর এক নেতা কর্মীদের টেনে হিচড়ে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়।

আরজি কর কান্ডের প্রতিবাদে এবং সিবিআই তদন্তের দাবিতে আরজি কর হাসপাতালে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচিতে কাউন্সিলর সজল ঘোষ সহ বিজেপি কর্মীবৃন্দ।

এবারের রাখী, প্রতিবাদের রাখী!

বিজেপি মহিলা মোর্চার পক্ষ থেকে তিলোত্তমা কলকাতা জুড়ে রাখী বন্ধন উৎসবে সম্মিলিত নারীশক্তি

ছবিতে খবর

আরজি কর কান্ডের প্রতিবাদে এবং মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে
ভারতীয় জনতা পার্টির ডাকে জেলায় জেলায় অবরোধ-অবস্থান-বিক্ষোভ

আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে এবং মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে ভারতীয় জনতা পার্টির ডাকে জেলায় জেলায় অবরোধ-অবস্থান-বিক্ষোভ

কোচবিহার সাংগঠনিক জেলার বর্ধিত জেলা কার্যকারিণী বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি বিধায়কগণ, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তী সহ জেলা নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দ

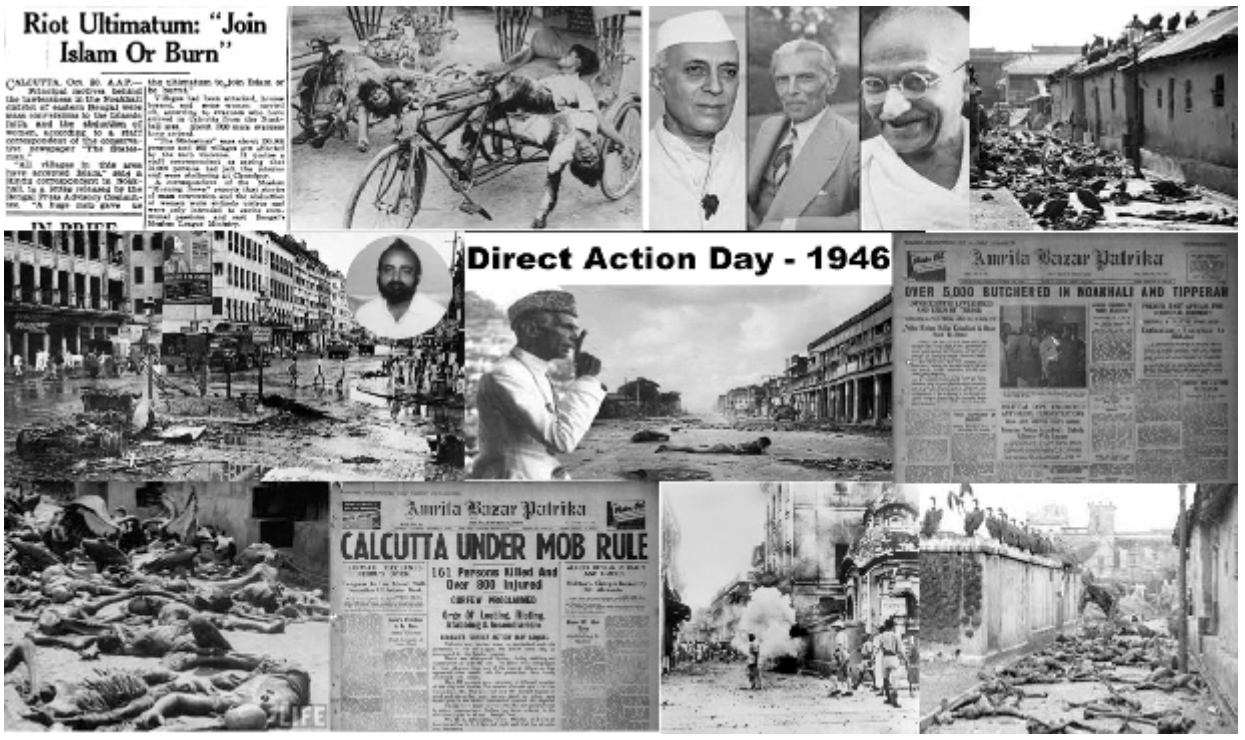

ভারত মায়ের বিভাজনের বিভীষিকা

অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিভীষিকার সেই ১৪ই অগাস্ট- যেদিন ভারত মায়ের বুক চিরে জন্ম নিয়েছিল পাকিস্তান। এই ভয়াবহ দিনেই কোটি কোটি মানুষ বাস্তুহারা হয়েছিলেন। সেদিনের সেই বিভাজনের বিভীষিকা স্মরণ করা আজকের ভারতবাসীর অবশ্য কর্তব্য।

মুসলিম লীগ ১৯৪৬-এর ১৬ই অগাস্ট জুম্মাবারে (শুক্রবার) সারা ভারতবর্ষে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম (Direct Action) এর ডাক দেয়। অখণ্ডিত বঙ্গে তখন 'কলকাতার কসাই' হিসাবে পরিচিত কুখ্যাত হোসেন সুহরাওয়ার্দী-র নেতৃত্বে মুসলিম লীগের সরকার। তখনকার কলকাতার প্রখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'প্রবাসী' তার ৩৫৩ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় লেখে যে, লীগ বহুদিন ধরেই ১৬ই অগাস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। প্ররোচনামূলক লক্ষাধিক পুস্তিকা বিতরণ করা হয়। এরকমই একটি উর্দু পুস্তিকাতে লেখা হয় যে, "এই রমজান মাসেই ইসলাম ও কাফিরদের মধ্যে প্রথম যুদ্ধ শুরু হয়েছিল ⋯ এই রমজান মাসেই আমরা মক্কায় জয়লাভ করি এবং সেখান থেকে মূর্তিপূজকদের তাড়িয়ে দি। এই রমজান মাসেই ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আল্লাহ-র ইচ্ছানুসারে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ পাকিস্তান গঠনের জন্য জেহাদের ডাক দিয়েছে এই রমজান মাসেই।" এই পুস্তিকাটিতে তখনকার কলকাতার মেয়র ও কলকাতা জেলা মুসলিম লীগ এর সম্পাদক মুহাম্মদ উসমান এর স্বাক্ষরও ছিল। মুসলিম লীগ সরকার দাঙ্গাকে পরিপূর্ণ রূপ দেওয়ার জন্য ১৬ই অগাস্ট ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করে। ইতিহাসবিদ রমেশচন্দ্র মজুমদার যিনি তখন কলকাতাতেই অবস্থান করছিলেন তাঁর বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে- ১৫ই অগাস্ট রাত্রিরে মুসলিম লীগের স্বেচ্ছাসেবকরা কলকাতার মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে মিছিল করে জেহাদের ডাক দেয় এবং 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' স্লোগান তোলে। ১৬ তারিখ সকাল থেকেই মানিকতলা, রাজাবাজার, মেছুয়াবাজার, টেরেটিবাজার, বেলগাছিয়া এবং অন্যান্য মুসলিম-সংখ্যাগুরু অঞ্চলগুলিতে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ শুরু হয়ে যায়। এইসময় তোলা বিভিন্ন ছবিতে দেখা গেছে যে, এইদিন ময়দানে মুসলিম লীগের সভায় উপস্থিত জনতা লাঠি, তরবারী, ছুরি ও অন্যান্য এই ধরণের অস্ত্র নিয়ে উপস্থিত হয়। এই সভায় মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ উস্কানিমূলক বক্তৃতা দেন এবং হিন্দুদের বিরুদ্ধে জেহাদের জন্য আহ্বান করেন। মিছিল ফেরত উত্তেজিত জনতা হিন্দু দোকানগুলিতে লুঠ ও নির্বিচারে হিন্দু

নিধন ও নারী ধর্ষণ চালাতে থাকে। সুহরাওয়ার্দী নিজে লালবাজারের পুলিশ কন্ট্রোল রুমে বসে থেকে পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে রাখেন। ১৬ তারিখ সন্ধ্যার মধ্যেই হিন্দুরা বুঝতে পারে যে মুসলিম লীগ সরকারের পুলিশ তাদের কোনরকম সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না। পাড়ায়- পাড়ায় যুবকরা সংগঠিত হতে থাকে। লাঠি, ছোরা প্রভৃতি সংগ্রহ করা হয়। ১৭ তারিখ সকাল বেলা হিন্দু পাড়াগুলোতে মুসলিম আক্রমণ তারা সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করে। এই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে কোথাও কোথাও পাল্টা হিংসাও শুরু হয়। ১৮ তারিখে মূলত বাঙ্গালীদের নেতৃত্বে বিহারী ও শিখরা মুসলিম অঞ্চলগুলোতে ভয়াবহ আক্রমণ নামিয়ে আনে। আপাত শান্ত, নির্ঝঞ্ঝাট, শিক্ষিত বাঙ্গালীর এই ভয়াল, ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসায় মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ স্তম্ভিত হয়ে যায়। মুসলিম লীগের দীর্ঘ শাসনে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া বাঙ্গালী হিন্দু নিজেদের প্রাণ ও মা-বোনেদের ইজ্জত বাঁচাতে একদম মরিয়া হয়ে ওঠেছিল। শেষপর্যন্ত মুসলিম লীগ সরকার বাধ্য হয়ে ১৯ তারিখে সেনাবাহিনী নামায়। এই দাঙ্গায় হিন্দু-শিখ-মুসলিম মিলিয়ে ৫ হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়।

এই গণহত্যার মাস্টারমাইন্ড। সুহরাওয়ার্দী সরকার মধ্যযুগীয় বর্বরতার এই খবরগুলি কিছুদিন চেপে রাখে। সেইসময়ের সংবাদপত্র অনুযায়ী প্রায় ৫,০০০ হিন্দুকে হত্যা করা হয়েছে ও এর কয়েক গুণ আহত হয়েছে এবং প্রায় দেড় লক্ষ মানুষের বাড়ি-ঘর ধ্বংস করা হয়েছে ও তাদের পশুর মত জীবনযাপনে বাধ্য করা হচ্ছে। ১৬ই অক্টোবর "যুগান্তর" লিখছে "নোয়াখালি কলকাতার কলঙ্ককেও ম্লান করেছে। হাজার হাজার নিরীহ লোককে অমানুষিকভাবে হত্যা। ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সুপারের ঔদাসীন্য। অবর্ণনীয় নির্যাতন ভোগের পর অন্যূন দশ হাজার লোক ধর্মান্তরিত। কয়েক সহস্র মহিলা অপহৃতা।" "যুগান্তর" ১৮ই অক্টোবর লেখে "পাঁচসহস্রাধিক নিহত ও অর্ধলক্ষাধিক বিপন্ন।"

কলকাতা দাঙ্গার প্রতিশোধ নেওয়ার পরিকল্পনা করা হয় নোয়াখালিতে। বর্তমান বাংলাদেশের নোয়াখালি, লক্ষ্মীপুর ও ফেনী জেলা নিয়ে মেঘনার বাম তীরে অবস্থিত ছিল ব্রিটিশ আমলের নোয়াখালি জেলা। তদানীন্তন পূর্ববঙ্গের এই জেলাতে হিন্দুরা ছিল মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৮%। ১৯৪৬-এর ১০ই অক্টোবর কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার দিন উৎসবমুখর হিন্দু বাড়িগুলিতে এক ভয়ংকর বিভীষিকা নামিয়ে আনা হয়। গণহত্যা, লুঠ, গৃহে অগ্নিসংযোগ, অপহরণ, ব্যাপকহারে নারী ধর্ষণ, মহিলাদের তুলে নিয়ে গিয়ে আটক করে রাখা এবং বলপূর্বক ধর্মান্তরণ ছিল এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রাক্তন বিধায়ক মৌলানা গোলাম সারওয়ার ছিলেন

১৯৪৬-এর ১০ই অক্টোবর, লক্ষ্মীপূজার দিন, বৃহস্পতিবার গোলাম সারওয়ার রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত সাহাপুর ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে প্রায় ১৫,০০০ মুসলিম জনতার সামনে প্ররোচনামূলক বক্তৃতা দেন। এরপরেই গণহত্যা শুরু হয়ে যায়। নারা-এ-তকবির, আল্লাহো আকবর, পাকিস্তান জিন্দাবাদ, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান, মারকে লেঙ্গে পাকিস্তান, মালাউনের রক্ত চাই ইত্যাদি ধ্বনি দিতে দিতে দিকে দিকে মুসলিমরা ছড়িয়ে পড়ে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক সুরঞ্জন দাসের মতে, জনতা চেয়েছিল হিন্দুদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করতে- তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করে, তাদের পূজিত মূর্তিকে অপবিত্র করে, তাদের মহিলাদের ধর্ষণ করে এবং তাদের জোর করে ইসলামে ধর্মান্তরিত করে। অন্বেষা রায় তাঁর কেমব্রিজ থেকে সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ 'Making Peace, Making Riots: Communalism and Communal Violence, Bengal 1940-1947' –এ বলেছেন, ধর্মান্তরণ ছিল এই নোয়াখালি দাঙ্গার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য- যা অন্যান্য দাঙ্গা থেকে একে পৃথক করেছে। তাঁর মতে, জোর করে ধর্মান্তরণ ছিল পূর্বপরিকল্পিত, কোন স্বতঃস্ফূর্ত ঘটনা নয়। সিম্পসন রিপোর্ট অনুযায়ী ফরিদপুর, চাঁদপুর ও হাজিগঞ্জে প্রায় প্রায় ২২,৫৫০ জনকে ধর্মান্তরণ করা হয়েছে। অন্বেষা রায় আরও লিখেছেন, দাঙ্গা ছিল সম্পূর্ণরূপে পূর্বপরিকল্পিত এবং লীগ নোয়াখালিকে পাকিস্তান গঠনের পরিকল্পনার গবেষণাক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিয়েছিল। রায়ের মতে, শ্রেণীগত স্বার্থকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা না গেলেও হিংসার ভয়াবহতা থেকে বোঝা যায় এর পিছনে মূল কারণ ছিল ধর্মীয়। অশোকা গুপ্ত লিখেছেন যে, ধর্মান্তরণের পর হিন্দুদের তাদের খুড়তুতো-জ্যেঠতুতো বোনেদের বিয়ে করতে বাধ্য করা হত। শান্তনু সিংহের 'নোয়াখালি নোয়াখালি' অনুযায়ী, নোয়াখালি জেলার দাঙ্গা কবলিত গ্রামগুলিতে এমন পরিবারের সংখ্যা খুব কমই ছিল, যে পরিবারের কোন না কোন মেয়ে অপহৃতা বা ধর্ষিতা হয়নি।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় অনুমোদন পেলো

ইউনিফায়েড পেনশন স্কিম

নিশ্চিত ৫০% পেনশন

অবসর গ্রহণের (সুপার অ্যানুয়েশন) আগে শেষ ১২ মাস যে বেসিক স্যালারি ছিল, সেই গড় বেসিক স্যালারির ৫০ শতাংশ অর্থ নিশ্চিতভাবে মিলবে

ন্যূনতম ১০ বছর চাকরির ক্ষেত্রে অনুপাতের ভিত্তিতে পেনশন প্রদান করা হবে

নিশ্চিত ৬০% ফ্যামিলি পেনশন

সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীর মৃত্যুর ঠিক আগেই যে পেনশন থাকবে, সেটার ৬০ শতাংশ নিশ্চিতভাবে মিলবে

ন্যূনতম নিশ্চিত পেনশন

ন্যূনতম ১০ বছর চাকরি করলে মাসে ন্যূনতম ১০,০০০ টাকা পেনশন মিলবে

উপকৃত হবেন ২৩ লাখ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী

জামাত ও সেনার দখলে বাংলাদেশ

কপাল পুড়লো হিন্দুদের

সৌভিক দত্ত

প্রকৃতপক্ষে পুরো বাংলাদেশটাই এখন বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে লড়াইয়ের মুক্তক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেকে চাইছে এই অরাজকতার মধ্যে যতটা সম্ভব সুবিধা আদায় করে নিতে। আর এই অরাজকতা ভারতসহ দক্ষিণ এশিয়ার জন্য কখনোই ভালো ফলাফল বয়ে আনবে না।

আবার শাসনতন্ত্র পরিবর্তন হল বাংলাদেশে। আবারও গণতান্ত্রিক সরকার ছেড়ে জামাত ও সেনা আধিপত্যের বলয়ে প্রবেশ করল বাংলাদেশ। আবারও সংখ্যালঘু নির্যাতন প্রবল আকার ধারণ করল সীমান্তের ওপারে।

১৯৭১ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে পাকিস্তানের পরাজয়ের ফলে এই ছোট্ট দেশটির জন্ম। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের এই সাফল্য স্বাভাবিকভাবেই খুশি করেনি অনেককে। তার মধ্যে যেমন ছিল চিন, আমেরিকা আর পাকিস্থান তেমনি ছিল কট্টর ইসলামিক শক্তিগুলি। বস্তুতপক্ষে দেশটা ছোট হলেও ভূরাজনৈতিক দিক থেকে এই ভূখণ্ডটির গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। একাত্তরে স্বাধীনতার আগে থেকেই এই দেশটি হয়ে উঠেছিল বিভিন্ন বৈদেশিক শক্তি ও তাদের দালালদের ক্রীড়াভূমি।

যদিও শেখ মুজিবুর রহমান ব্যক্তিগত জীবনে কতটা অসাম্প্রদায়িক ছিলেন তা নিয়ে প্রশ্ন তোলাই যায়, কিন্তু যতদিন মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের শাসনে ছিলেন ততদিন সে দেশের সংখ্যালঘুর উপরে তেমন একটা অত্যাচার হয়নি। হ্যাঁ রমনা কালীবাড়ি পুনর্নির্মাণ করতে দেওয়া হয়নি, তাদের জমি ফেরত দেয়া হয়নি সেসব আলাদা বিষয় কিন্তু মুজিবের শাসনে হিন্দুরা অন্য সময়ের তুলনায় পূর্ব বাংলায় শান্তিতেই ছিল। কিন্তু পাকিস্তানপন্থী মেজরদের সামরিক অভ্যুত্থানে মুজিবর নিহত হওয়ার পরপরই দেশটির উপরে নৈরাজ্য ও অরাজকতার কালো ছায়া নেমে আসে। যে ছায়া থেকে দেশটি সম্ভবত আজও মুক্ত হতে পারেনি।

মুজিব পরবর্তী বাংলাদেশ ছিল মূলত পাকিস্তানপন্থীদের পুনর্বাসন দেওয়ার সময়। সেনা শাসক জিয়া ও এরশাদের হাত ধরে বাংলাদেশে পাকিস্তানপন্থীরা আবার ক্ষমতায় ফিরে আসে। আর তারপর দীর্ঘ সময় ধরে বাংলাদেশ একদিকে স্বাধীনতাপন্থী মুক্তিযোদ্ধা ও অন্যদিকে পাকিস্তানপন্থী মৌলবাদীদের আন্দোলন ও প্রতি আন্দোলনের যুদ্ধক্ষেত্র হয়েই থেকে গেছে। এই শেষ তথাকথিত কোটা বিরোধী আন্দোলনটিও প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানপন্থীদের দ্বারা পরিচালিত আমেরিকা সমর্থিত আন্দোলন, যেখানে ছাত্ররা প্রকৃতপক্ষে দাবার বোড়ে ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানপন্থী মৌলবাদীদের ক্ষমতা বিস্তারের প্রধান বাধাই হল হিন্দুরা। আর

সেজন্যই উনিশশো সাতচল্লিশার দেশভাগের আগে থেকেই পূর্ব বাংলায় ক্রমাগতভাবে চলে আসছে হিন্দু গণহত্যা। সেই শেখ মুজিবর- এর আমল থেকেই বাংলাদেশের হিন্দুরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। পাকিস্তানিদের দখল করে নেওয়া রমনা কালী বাড়ির জমিও মুজিবর ফেরত দেয়নি হিন্দুদের। বস্তুত সেই তখন থেকে এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশে যেকোনও উপায়ে, যেকোনও ছুতোয় হিন্দু নির্যাতনটাই হল ওই দেশে একটি ট্রাডিশন। এইবারের আন্দোলনে তার ব্যাতিক্রম হয়নি। নামে কোটাবিরোধী আন্দোলন হলেও শুরু থেকেই এদের অন্যতম কাজ ছিল হিন্দুদের উপর অত্যাচার করা।

কিন্তু প্রশ্ন হল হঠাৎ এই আন্দোলন কেন? বাংলাদেশের মধ্যে বিএনপি, জামাত বা অন্যান্য পাকিস্তানপন্থীদের স্বার্থ না হয় বোঝা যায়। যেকোনও পরিস্থিতিতে তারা চাইবেই তাদের হারানো ক্ষমতায় ফিরে পেতে। কিন্তু আমেরিকা হঠাৎ করে এখানে হাসিনা বিরোধী আন্দোলনে ফান্ডিং করতে গেল কেন? এর উত্তর পেতে হলে আমাদের তাকাতে হবে একটু বিশ্ব ভূগোলের দিকে।

চিনের অপরিশোধিত তেল আমদানির ৮০ শতাংশ সম্পন্ন হয় মালাক্কা প্রণালীর মধ্যে দিয়ে। কিন্তু এই মালাক্কা প্রণালী একেবারে নিরাপদ নয়। যদি কোন চিন বিরোধী শক্তি এই মালাক্কা প্রণালীর উপর কব্জা করে নেয় তবে চিনকে শক্তির অভাবে অচল হয়ে যেতে হবে। আর সেই জন্য চিন চেষ্টা করছে বিভিন্ন বিকল্প পথ খুঁজে বের করার। যার অন্যতম হলো, চিন-মায়ানমার ইকনমিক করিডোর (CMEC) - এর মায়ানমার-ইউনান পাইপলাইন। এর জন্যই মায়ানমারের রাখাইন প্রদেশে তৈরি করা হয়েছে কিয়াউকপিউ সমুদ্র বন্দর। মায়ানমার ও ইয়ুনান পাইপ লাইনটি মিয়ানমারের বন্দর হয়ে মধ্যপ্রাচ্য থেকে চিনে তেল পরিবহনের জন্যও ব্যবহার করা হবে। চিন-এর সাথে চট্টগ্রাম বন্দরকে যুক্ত করার জন্যও ইতিমধ্যে বাংলাদেশকে প্রস্তাব দিয়ে রেখেছে।

মালাক্কা প্রণালীর আর একটি বিকল্প পথ হল মায়ানমার ও বাংলাদেশ হয়ে ভারতের সাথে সংযোগ। রাজনীতির জটিল নিয়মে আমেরিকার প্রভাব এই এলাকায় কমিয়ে রাখতে ভারত এই প্রকল্পে অংশীদার হতে চায়। বিশেষত উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিকে নিয়ে খ্রিস্টান রাষ্ট্র তৈরির ষড়যন্ত্র ভারতকে যথেষ্ট চিন্তায় ফেলেছে। সেই কারণে ভারতও চায় বাংলাদেশ-চিন-ভারত- মায়ানমার (BCIM) ইকনমিক করিডোরের বাস্তবায়ন। শেখ হাসিনার অতি শখের পদ্মা সেতুও এই সংযোগেরই অংশ। যার উপর দিয়ে ভারত করিডোরও চেয়েছে।

আর চিনের এই বিকল্প পথগুলিকে বাস্তবায়নে বাধা দিতে আমেরিকার প্রবেশ বাংলাদেশের রাজনীতিতে। অবশ্য শুধু এই ক্ষেত্রে না, এর আগেও আমরা জানি বাংলাদেশ নাকি গ্যাসের উপরে ভাসছে এমন একটা গুজব আমেরিকা ছড়িয়ে দিয়েছিল। এবং বাংলাদেশের তৎকালীন ভোট রাজনীতিতে এই গ্যাসের অন্যতম প্রভাব পরেছিল। ঘটনা আর কিছুই না, ইরান থেকে পাকিস্তান হয়ে ভারতে গ্যাস আনার যে প্রজেক্ট সে সময় নেওয়া হয়েছিল, সেখান থেকে ভারতকে সরিয়ে আনতে বাংলাদেশে অভাবনীয় খনিজ গ্যাস থাকার গুজব ছড়ানো হয়েছিল। যাতে ঘরের পাশে গ্যাস পেয়ে যাওয়াই ভালো তার ইরানের সাথে গ্যাস আনার চুক্তি বাস্তবায়নে না যায় আর ইরান অর্থনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী না হতে পারে।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে বৃহত্তর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বারবারই দাবার গুটি হয়েছে। আর এবারও চিন-কে দুর্বল করার জন্য আমেরিকার প্রয়োজন ছিল মায়ানমার ও বাংলাদেশে নিজেদের সমর্থিত সরকার বসানোর। বলা চলে যে চিনের বিকল্প পথগুলি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যই পাশাপাশি এই দুটি দেশে দুজনকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। মায়ানমারের নোবেল যথেষ্ট রিটার্ন দিয়েছে আমেরিকাকে। আর এখন বাংলাদেশের নোবেল ক্ষমতায় বসে আমেরিকার বিনিয়োগ আরো সফল করছে। আর এখানে উঠে আসছে সেন্ট মার্টিন দ্বীপের কথা। বাতাসে গুজব এই যে বাংলাদেশের বর্তমান সরকার এই দ্বীপ আমেরিকার হাতে তুলে দিতে চায় সামরিক বেস বানানোর জন্য। বলা হচ্ছে যে হাসিনা যদি সেন্ট মার্টিন দ্বীপ আমেরিকাকে তুলে দিত, তাহলে হয়তো এত কিছু আন্দোলনের প্রয়োজনই পড়তো না। সেন্ট মার্টিন দ্বীপে আমেরিকার আর্মি বেস তৈরি হলে তা ভারত ও চিন উভয়ের জন্যেই বিপদজনক হবে।

শুরুতে কোটা বিরোধী আন্দোলন হিসেবে শুরু হলেও ধীরে ধীরে এ আন্দোলন তার আসল চেহারা নেয়। হয়তো সবাই কমবেশি জানেন, তবুও এই প্রসঙ্গে কোটার বিষয়টা বলে রাখা উচিত। আমাদের দেশে যেমন সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ দেওয়া হয় প্রধানত কাস্ট এর উপরে ভিত্তি করে, বাংলাদেশে সংরক্ষণ দেওয়া হতো মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের উপরে ভিত্তি করে। অর্থাৎ ১৯৭১-এর যুদ্ধে যারা অংশ নিয়েছিল তাদের পরিবার সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা কোটা পেত। যাকে বলা

হতো মুক্তিযোদ্ধা কোটা। অবশ্য এর বাইরে নারী কোটা, উপজাতি কোটা, পিছিয়ে পড়া জেলা কোটা ইত্যাদিও ছিল। তবে আন্দোলনকারীদের মূল দাবী ছিল মুক্তিযোদ্ধা কোটা বাতিল করা। শুরুতে আন্দোলন ততটা শক্তিশালী ছিল না। বলতে গেলে এক রকম নিয়ন্ত্রণেই চলে এসেছিল। কিন্তু এই অবস্থাতেই শেখ হাসিনা একটি মারাত্মক ভুল করে ফেলে, আর সরকারটাকে প্রায় নিজের হাতে জামাত-বিএনপি ইত্যাদি পাকিস্তানপন্থীদের হাতে তুলে দেয়। ঘটনা আর কিছুই না, আন্দোলন চলাকালীন একটি সাংবাদিক সম্মেলনে হাসিনা কথা প্রসঙ্গে যারা মুক্তিযোদ্ধা কোটা পায়না, তাদের রাজাকার সন্তান বলে অভিহিত করে দেন। শেখ হাসিনার মত একজন অভিজ্ঞ বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদের পক্ষে এটা একটা মারাত্মক ভুল অবশ্যই। এছাড়াও বাংলাদেশের জটিল হিসেবে মুক্তিযোদ্ধা বা রাজাকার ভাগাভাগিটাও এতটা সহজ নয়। মুক্তিযোদ্ধা হলেই যে সে স্বাধীনতার পক্ষে থাকবে তেমন কোন কথা নেই। যাইহোক সে সব অন্য প্রসঙ্গ, তবে মোটের কথা হল, মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের ছেলেমেয়েরা এই রাজাকার ট্যাগকে একেবারেই ভালোভাবে নেয়নি এবং যারা এতদিন আন্দোলনে ছিল না তারাও আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হাসিনার কথার প্রতিবাদ করতে গিয়ে নিজেদের রাজাকার বলে পরিচয় দিতে শুরু করে দেয়।

আর এখান থেকে মূলত শুরু হয় এই পুরো আন্দোলনের রাশ জামাত শিবিরের হাতে উঠে আসা ও হাসিনার ক্ষমতাচ্যুতির পথ প্রশস্ত হওয়া। তবে হ্যাঁ এই আন্দোলনের রহস্য কম নেই। যেমন যে পুলিশরা গুলি চালিয়েছিল তারা প্রত্যেকে আসলেই পুলিশ কিনা তার কোন প্রমাণ নেই। এমন অনেক গুলি পাওয়া গেছে যেগুলো বাংলাদেশের পুলিশ ব্যবহারই করে না। আবার কোন ক্ষেত্রে এমন দিক থেকে গুলি লেগেছে যেদিকে কোন পুলিশই ছিল না। অবস্থা সাপেক্ষে এটাই মনে হয় যে সাধারণ মানুষকে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য সাধারণ ছাত্রদের বলি চড়ানো হয়েছিল। যার শেষ পরিণতি হল প্রবল আন্দোলন, সরকারের পাশ থেকে সেনাবাহিনীর সরে যাওয়া এবং সবশেষে হাসিনার দেশত্যাগ।

এই প্রসঙ্গে আরো একটি তথ্য গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামানকে সেনাপ্রধান পদে নিয়োগ করার সময় ভারতের গোয়েন্দা বিভাগ নাকি আপত্তি জানিয়েছিল। এই সেনাপ্রধানের উচ্চাশা এবং মৌলবাদী যোগ নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিল তারা। কিন্তু শেখ হাসিনা নিজের এই আত্মীয়কে এতটাই অন্ধের মত ভরসা করতেন যে, ভারত সরকারের সতর্কবার্তাকে কানেই তোলেন নি। অবশ্য তার বাবাও একই কাজ করেছিলেন। শেখ মুজিবর- কেও ভারত সরকারের পক্ষ থেকে সতর্ক করা হয়েছিল যে তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা চলছে। কিন্তু শেখ মুজিবও শেখ হাসিনার মতই সেই তথ্যকে পাত্তা দেয়নি। আর তার পরের ইতিহাস তো আমাদের সবারই জানা।

তবে যাই হোক না কেন অন্যান্য সব আন্দোলনের মতো এই আন্দোলনে শেষ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে হিন্দুদেরই। আন্দোলন চলার সময় খবর আসছিল বেশ কিছু জায়গায় শুধুমাত্র হিন্দু বলেই আক্রমণ করা হচ্ছে। তবে তখনও পর্যন্ত কিছুটা আত্মনিয়ন্ত্রণ হয়তো তাদের ছিল। কিন্তু হাসিনা সরকারের পতনের পরে সেইটুকুও তাদের চলে যায়। জায়গায় জায়গায় হিন্দুদের উপর অত্যাচার শুরু হয়। শুরু হয়ে যায় হিন্দুদের মন্দির ভাঙ্গা, বাড়ি লুঠ, মেয়েদের ধর্ষণ এবং ব্যবসায়ীদের থেকে জোর করে টাকা আদায়। মন্দিরগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ফেনি শহরের দুর্গামন্দির, দিনাজপুরের পার্বতীপুর কালীমন্দির, ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জের ২ নম্বর ইউনিয়নের শ্মশান মন্দির, নেত্রকোনা শহরে রামকৃষ্ণ মিশন এবং ইসকন মন্দির। মেহেরপুরে ইসকন মন্দিরে হামলা চালিয়ে জগন্নাথ বিগ্রহ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এসব তো বড় বড় মন্দির বলে তাও খবরে এসেছে, এমন কত ছোট ছোট মন্দিরকে আগুনে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে ফেলা হয়েছে তার খবরই বা কে রাখে? এমনকি শিল্পী রাহুল আনন্দের বাড়িতে আক্রমণ করে তার বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, ধ্বংস করে ফেলা হয় তার নিজের হাতে তৈরি সমস্ত বাদ্যযন্ত্র। গান-বাজনা যে হারাম। শুধুমাত্র হিন্দু হওয়ার অপরাধে মৃণাল কান্তি চট্টোপাধ্যায় নামে এক হিন্দু শিক্ষককে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে বাগেরহাটে। রেহাই দেওয়া হয়নি তার স্ত্রী ও মেয়েকেও। এমনকি এই দুদিন আগে, ভারত নাকি ড্যামের জল ছেড়ে দিয়ে বাংলাদেশ বন্যা ঘটিয়েছে, ফেসবুকে এমন ফেক খবর শুনে উত্তেজিত হয়ে একজন মন্দির ভাঙচুর করে দিয়েছে। বাংলাদেশে প্রকৃতপক্ষে হিন্দুদের অবস্থা এটাই, যেকোনো ছুতোয় মন্দির ভাঙচুর করা ওখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠদের একটা শখ মাত্র।

বাংলাদেশ ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী। বাংলাদেশ যতক্ষণ অস্থিতিশীল থাকবে, তা ভারতের জন্য কোনোভাবেই ভালো হবে না। আর বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের সৌজন্যে সেই দেশের মধ্যে অস্থিতিশীলতা প্রতিদিন বেড়েই চলেছে। ঢাকাতে সাধারণ রিক্সাচালক ও মোটরচালিত রিক্সাচালকদের মধ্যে ঝামেলা বেধেছে। দুদিন আগে বেঁধেছিল ছাত্রদের সঙ্গে আনসার বাহিনীর ঝামেলা। প্রকৃতপক্ষে পুরো বাংলাদেশটাই এখন বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে লড়াইয়ের মুক্তক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেকে চাইছে এই অরাজকতার মধ্যে যতটা সম্ভব সুবিধা আদায় করে নিতে। গোটা বাংলাদেশটাই বর্তমানে মাৎস্যন্যায়ের মধ্যে দিয়ে চলছে। আর এই অরাজকতা ভারতসহ দক্ষিণ এশিয়ার জন্য কখনোই ভালো ফলাফল বয়ে আনবে না। বর্তমানের ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে এই অঞ্চলের মুক্তি চাওয়াটা যেকোনও শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের অবশ্য কর্তব্য।

নরেন্দ্র মোদীর 'স্ট্র্যাটেজিক অটোনমি' ভারত-রুশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক

অনিকেত মহাপাত্র

সত্যি কথা বলতে কি শেষ এক দশকে ভারতের বিদেশনীতি সাবালক হয়েছে ; কোনও' ইজম' বা 'প্যাশন'-এর বশবর্তী না হয়ে দেশের বৃহত্তর স্বার্থকে সামনে রেখে দিশা স্থির করেছে নিজের। এই প্রিজমে দেখতে হবে ভারত-রুশ সম্পর্ককে। ভারত মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দ্বর্থ্যহীন ভাষায় নিজের বক্তব্য জানায় কিন্তু বন্ধুত্বকে কাজে লাগায় না বন্ধু রাষ্ট্রকে অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে ফেলতে।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির আঙিনায় বলা হয় , ভারত-রাশিয়ার সম্পর্ক দীর্ঘদিন ধরেই মোটের ওপর মধুর। কখনও কখনও সামান্য চড়াই-উৎরাই থাকলেও তা নির্ণায়ক কিছু নয়। ২০২৪এ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রাশিয়া সফর এবং সেই সফরকালে দুই শীর্ষনেতার পারস্পরিক রসায়ন নিয়ে বিশ্বের কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন কারণ রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ চলেছে। আর এই সময়পর্বে একটি রুশ হানায় একাধিক শিশুর মৃত্যুর ঘটনা ঘটে । ফলে সময়ের বিড়ম্বনা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে । এই ইস্যুতে আরও একটি মাত্রা যোগ হয়েছে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে রাশিয়ার সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কারে ভূষিত করার পর।

ভারত নরেন্দ্র মোদীর সময়ে বরাবরই 'স্ট্র্যাটেজিক অটোনমি'র ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। একটি স্বাধীন দেশ তার নিজের প্রয়োজন মতো নিজের বিদেশনীতি স্থির করবে, প্রভাবিত হবে না কারোর দ্বারাই। কেউ বাধ্য করতে পারবে না হুমকি দিয়ে। এই কাঙ্খিত অবস্থানের পক্ষে ভারতের বিদেশমন্ত্রী ড.এস.জয়শঙ্কর দেশ-বিদেশের বিভিন্ন মঞ্চে বারবার সওয়াল করেন। শুধু তাই নয় আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের বেশ কয়েকটি বক্তৃতায় নিজের দেশের বিদেশনৈতিক স্বাভিমানের দেউলিয়াপনাকে স্পষ্ট করে তার বিপরীতে ভারতের স্বাবলম্বী বিদেশনীতির কথা উঠে এসেছিল। তাই বিরোধীরা যতই অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তুলুক না কেন, বিদেশনীতি নিয়ে খুব একটা দাঁত ফোটানোর সাহস দেখায় নি। সত্যি কথা বলতে কি শেষ এক দশকে ভারতের বিদেশনীতি সাবালক হয়েছে ; কোনও' ইজম' বা 'প্যাশন'-এর বশবর্তী না হয়ে দেশের বৃহত্তর স্বার্থকে সামনে রেখে দিশা স্থির করেছে নিজের । এই প্রিজমে দেখতে হবে ভারত-রুশ সম্পর্ককে।

ভারত কখনও তার যথার্থ বন্ধুকে ভোলে না। বিভিন্ন সময়ে দেশটি এর প্রমাণ দিয়েছে। সাম্প্রতিক রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের সময়ে ভারত কিছু কিছু মঞ্চে এবং রুশ প্রেসিডেন্টের সামনে, এই শতাব্দী যে যুদ্ধের নয় তা দ্বিধাহীনভাবে জ্ঞাপন করেছে। কিন্তু দেশের প্রয়োজনে আমেরিকার হুমকির তোয়াক্কা না করে অশোধিত খনিজ তেল কিনেছে এবং কিনছে। রাষ্ট্রসংঘে বেশ কয়েকবার রাশিয়ার বিরুদ্ধে আনা প্রস্তাবে ভোট দেয় নি। কিন্তু ইউক্রেনে মানবিক সাহায্য নিরন্তর জুগিয়ে চলেছে। চলতি মাসের মাঝামাঝি যে খবর আমরা দেখেছিলাম, আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছিলেন যে ভারত, রাশিয়ার সঙ্গে তার বন্ধুত্বকে ব্যবহার করে

রাশিয়াকে বার্তা দিক যেন দেশটি রাষ্ট্রসংঘের সনদগুলি ঠিকমতো মান্য করে এবং যুদ্ধ বন্ধ করতে উদ্যোগী হয়। অবশ্য তারা এই যুদ্ধকে 'বেআইনি যুদ্ধ' আখ্যা দিয়েছে। যুদ্ধের 'আইনি'-'বেআইনি'-র সংজ্ঞা নিরূপণের দিকে ভারত সরকার এগোয় নি। বরং উপযোগবাদের দ্বারা প্রাণিত হয়ে এবং ইতিহাসের থেকে নির্মোহ শিক্ষা নিয়ে এগিয়েছে। ম্যাথু মিলার-এর কথায় : "রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের দীর্ঘদিনের সুসম্পর্ক রয়েছে। এটা সবার জানা। আমরা চাই ভারত রাশিয়ার সঙ্গে এই সম্পর্ককে কাজে লাগাক এবং রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনকে বেআইনি যুদ্ধ বন্ধ করে শান্তি ফেরাতে বলুক। পুতিন যেন রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদকে এবং ইউক্রেনের সার্বভৌমত্বকে সম্মান করেন।"

ভারতের 'স্ট্র্যাটেজিক অটোনমি'র গুরুত্ব এখানেই যে ভারত মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দ্বর্থ্যহীন ভাষায় নিজের বক্তব্য জানায় কিন্তু বন্ধুত্বকে কাজে লাগায় না বন্ধু রাষ্ট্রকে অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে ফেলতে। সম্প্রতি ভারত-আমেরিকা প্রতিরক্ষা সম্পর্ক বিষয়ক একটি কনক্লেভ-এ ভারতে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত এরিক গারসেটি জানান যে তার দেশ ভারতের 'স্ট্র্যাটেজিক অটোনমি'র ধারাকে সম্মান করে কিন্তু সংঘাতের সময় এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ থাকে না। কারণ আজকের দুনিয়ায় আন্তঃসম্পর্ক- যুক্ত পৃথিবীতে কোনও যুদ্ধ আর দূরে থাকে না।

এরিক গারসেটি যে প্রসঙ্গ তুলেছেন সেখানেই মূল সম্ভাবনাগত এবং অবশ্যই সভ্যতাগত তর্কের প্রস্থানটি নিহিত। ইউরোপ ও আমেরিকার সমস্যাকে সারা বিশ্ব নিজের মনে করে আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকবে কিন্তু সুদানে কী হচ্ছে কিংবা দক্ষিণ চিন সাগরে কীভাবে চিন নিজের 'অন্যায়' আধিপত্য বাড়িয়ে পার্শ্ববর্তী দেশগুলির অখণ্ডতা নষ্ট করছে তা নিয়ে ইউরোপ - আমেরিকা ভাববে না বরং আঞ্চলিক সমস্যা মনে করে নিজেদের অবস্থান স্থির করে কর্তব্যের দিকটি এড়িয়ে যাবে। কিংবা বিবাদমান দুই পক্ষকে অস্ত্র সরবরাহ করে ডলার কামাবে এবং বিবাদের সুযোগ নিয়ে খুব কম ডলার খরচ করে ওই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করবে। ভারত তার বিদেশনৈতিক বীক্ষায় এই প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেছে। ইতিহাসের শিক্ষায় দেখা গেছে, চিনকে আটকানোর ক্ষেত্রে ভারত ইউরোপ-আমেরিকার সেইভাবে সাহায্য পায় নি। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানকে যেভাবে আমেরিকা ঋণ জাল থেকে মুক্ত করে পুনরায় সন্ত্রাস-বিষপ্রসূ অবস্থায় নিয়ে গিয়ে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা নষ্ট করতে চায়, তা ক্যালিফোর্নিয়ার প্রাক্তন গভর্নর ও ভারতে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত গারসেটির কথায় উঠে আসে নি। আসার কথাও নয়!

ইউরোপের সমস্যা একান্তই তার নিজের সমস্যা যেমন করে আমাদেরটা আমাদের। ড. এস. জয়শঙ্কর এই কথাটি বারবার বলেছেন এবং তা গ্লোবাল সাউথ-এর কাছে তা প্রায় আপ্তবাক্য। সাম্প্রতিক একটি খবরে দেখা গেছে, আমেরিকার ডেপুটি ট্রেজারি সেক্রেটারি ওয়েলি এডিয়েমো ভারতের ব্যাংকগুলিকে সতর্ক করে একটি চিঠি লিখেছেন। ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কস এসোসিয়েশনকে দেওয়া ওই চিঠিতে বলা হয়েছে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা শিল্প বা কোম্পানিগুলির সঙ্গে কোনও আর্থিক লেনদেনে তারা যেন না যায়, নয়তো আমেরিকার সঙ্গে আর্থিক লেনদেনের ব্যাপারে তাদের নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হবে।

আবার বিপরীত একটি চিত্র দেখা গেছে দিন কয়েক আগে আমেরিকান কংগ্রেসে। রিপাবলিকান সেনেটর মার্কো রুবিও একটি প্রস্তাব আনেন। সেই প্রস্তাবের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে সেনেটর মার্কো বলেন, "ভারত মহাসাগরীয় এলাকায় লাগাতার আগ্রাসন চালাচ্ছে কমিউনিস্ট চিন। ওই অঞ্চলের যে দেশগুলো আমেরিকার ঘনিষ্ঠদের তালিকায় রয়েছে, তাদের সার্বভৌমত্বে আঘাত হানছে। এই পরিস্থিতিতে আমেরিকার উচিত এই ষড়যন্ত্রের বিরোধিতা করা। বোঝানো উচিত, ভারত-সহ ওই এলাকার দেশগুলি মোটেই একা নয়।"

ডেমোক্রেটিকদের সময়ে রাশিয়াকে চিনের দিকে ঝুঁকে পড়তে প্রায় বাধ্য করা হয়েছে, যা একরকম কূটনৈতিক ব্যর্থতা বলে আমেরিকার বহু সাধারণ মানুষ ও বিদেশনীতির সঙ্গে যুক্ত কোনও কোনও গবেষক মনে করেন। রাশিয়া নয় বরং আমেরিকার বড়ো চ্যালেঞ্জার হল চিন, এই বিষয়টি ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। হেনরি কিসিঞ্জারদের মতো চিন ও আমেরিকা বন্ধুত্বের ধ্বজাধারীদের দাপট দেখা গেছে সরকার সহ স্টেট ডিপার্টমেন্টে। তারা ভুলে গেছে, এই চিন আমেরিকা-মুখাপেক্ষী নয় বরং প্রতিস্পর্ধী। কেটে গেছে মাঝে কয়েকটি দশক --এটি তাঁদের স্মৃতিতে নেই।

অনেকগুলি নতুন প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে রয়েছে। আত্মনির্ভর-ভারত উদ্যোগে রাশিয়ার সঙ্গে যৌথভাবে অস্ত্র উৎপাদন হবে ভারতেই। রাশিয়ার সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী পূর্বে পরিকল্পিত পারমাণবিক-শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রগুলি এবার স্থাপন হতে শুরু হলে ভারতের শক্তি-উৎপাদনের চিত্রে বিপুল পরিবর্তন আসবে। আর আমেরিকা কখনও কখনও চাপ তৈরি করতে সচেষ্ট হলেও ভারত তার জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় তৎপর। আমাদের দেশের আত্মবিশ্বাসী বিদেশনীতি প্রণেতারা আমেরিকাকে আমাদের বাধ্যবাধকতা ও আমেরিকার প্রকৃত চ্যালেঞ্জার যে চিন তা বোঝাতে সক্ষম হবেন। রাশিয়াকেও চিনের কৃষ্ণগহ্বরের কাছাকাছি আসতে দেওয়া থেকে রুখবেন। অবৈকল্পিক চিন-নির্ভরতা তখন অতীত হয়ে যাবে যখন ভারতের প্রচেষ্টায় রাশিয়া আবার ইউরোপ ও আমেরিকায় গৃহীত হবে । ফলে ভারতের বিদেশনীতির সার্থকতা নির্ভর করছে ভারসাম্য-রক্ষা ও প্রতিটি সুযোগকে সম্মান দেবার ওপর। দুঃসময়কেও ব্যবহার করতে পারলে তা হয়ে ওঠে চূড়ান্ত উর্বর-সময়ে। কোভিড এবং রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের সময় অন্তত ভারতের সেই সবল বিদেশনীতির পরিচায়ক হয়ে উঠেছে।

অলিম্পিকে ভারত

এগোচ্ছে দেশ, অন্ধকারে বাংলা

অভিরূপ ঘোষ

দুর্দান্ত পারফর্ম করলেও এবারে ভারতীয়রা মেডেল পায়নি শুধুমাত্র ঠোঁট এবং কাপের ছোট্ট পার্থক্যের কারনে। আশা করা হচ্ছে পরের অলিম্পিকেই পদক সংখ্যা অন্তত পনেরো হয়ে যাবে নিশ্চিতভাবে। কিন্তু মমতার হাতে ক্ষমতা থাকলে সেই দলে কজন বাঙালী থাকবে সে বিষয়ে সন্দেহ থাকবে।

১৪০ কোটির দেশে একটা রূপোর পদক আর পাঁচটা ব্রোঞ্জ। অনেকেই হতাশ। অনেকে গর্বিত। কেউ আশাহত আর কেউ বা প্রত্যাশায় বুক বাঁধছে পরের লস এঞ্জেলেস অলিম্পিকের জন্য। আশা নিরাশার কারণ আর অলিম্পিকের এই বিপুল কর্মযজ্ঞে আমাদের রাজ্যের অবদান নিয়ে আলোচনার আগে আসুন পদক পাওয়া এবং না পাওয়া সফল ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের সাথে একটু পরিচয় করে নেওয়া যাক।

সাফল্যের তালিকায় সবার উপরে যাঁর নাম আসবে তিনি মনু ভাকের। ১০ মিটার এয়ার পিস্তল শুটিংয়ের ব্যক্তিগত এবং মিক্সড টিম ইভেন্টে ব্রোঞ্জ মেডেল জিতে মনু স্বাধীন ভারতের একমাত্র এমন ক্রীড়াবিদ হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যিনি অলিম্পিকের একটা এডিশনে দু- দুটো মেডেল জিতেছেন। মিক্সড টিম ইভেন্টে মনুর সহযোদ্ধা হিসাবে ব্রোঞ্জ জেতেন সরবজোত সিং যিনি নিজের ব্যক্তিগত ইভেন্টে ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে ফাইনালে উঠতে পারেননি। ব্যক্তিগত ইভেন্টে যেখানে প্রথম আটজন ফাইনালে ওঠেন, সেখানে সপ্তম এবং অষ্টম স্থানাধিকারের সাথে একই পয়েন্ট স্কোর করেও ফাইনালে উঠতে পারেননি সরবজোত। শুটিংয়ে ভারতের তৃতীয় পদক আনেন মহারাষ্ট্রের স্বপ্নীল কুশলে, ৫০ মিটার থ্রি পজিশন রাইফেল শুটিংয়ে।

শুটিং ছাড়াও ব্রোঞ্জ এসেছে কুস্তিতে আমান শেরাওয়াত এবং হকিতে ছেলেদের টিমের হাত ধরে। উল্লেখ্য যে এই নিয়ে পরপর দুটো অলিম্পিকে মেডেল আনলো ছেলেদের দল। ইতিহাসের পাতা ধরে অনেকটা পিছনে চলে গেলে দেখা যায় একটা সময় হকিতে সোনার পদকটা ভারতীয় পুরুষ দলের একপ্রকার বাঁধা ছিল। সেই সময় অলিম্পিকে ভারত শুধু একটাই পদক পেতো। সেটা হকিতে আর সেটা সোনা। তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল পেরিয়ে গেছে। কংগ্রেস সরকার ভারতীয় হকির কৌলিন্য ধুয়ে মুছে সাফ করে দিতে চেয়েছে। একটা সময় তো পরিস্থিতি এমন

ছিল যে মনমোহন সিংয়ের সরকার হকি খেলোয়াড়দের জুতোটুকু কিনে দিতে চায়নি। অস্বাভাবিক নয় যে হকি জাদুকর ধ্যানচাঁদের দেশে সরকারি উদাসীনতা এবং অসহযোগিতার কারণে ২০০৮ সালে ভারত অলিম্পিকে চান্সও পায়নি। পরের অলিম্পিক অর্থাৎ ২০১২ সালে হকির গ্রুপ স্টেজের পাঁচটা ম্যাচের পাঁচটাতেই হেরে সবার শেষে শেষ করে ভারত। সেখান থেকে ২০১৬ সালে কোয়ার্টার ফাইনাল অব্দি পৌঁছানো এবং তারপর ২০২০ টোকিও অলিম্পিক ও ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ মেডেল জিতে দেশে ফেরে পুরুষদের ভারতীয় হকি দল। পরবর্তী অলিম্পিক অর্থাৎ লস এঞ্জেলেসে ২০২৮ সালের অলিম্পিকে, হকিতে সোনার জন্য লড়বে বলে ইতিমধ্যে ঘোষণা করে দিয়েছে ভারত।

ভারতের ষষ্ঠ পদক বিজেতা প্রত্যাশিতভাবেই নীরজ চোপড়া। জ্যাভলিন থ্রো-এ। নীরজ গতবার একই ইভেন্ট থেকে সোনা জিতেছিলেন। টোকিওর থেকে এবারে বেশি দূর বল্লম বা জ্যাভলিন ছুঁড়েও রুপোতেই সন্তুষ্ট হতে হয়েছে নীরজকে। দুর্ভাগ্য নীরজের। তবে তার থেকেও বেশি দুর্ভাগ্য সম্ভবত এমন ছ'জনের যারা খুব অল্পের জন্য পদক হাতছাড়া করেছেন এবারে।

তালিকার প্রথম নাম মনুর। দুটো ব্রোঞ্জ জিতলেও এবারে তার পদক সংখ্যা খুব সহজেই তিন হতে পারতো। কিন্তু ২৫ মিটার পিস্তল ইভেন্টে একটা শটে খুব অল্প এদিক ওদিক হওয়ার জন্য দু'নম্বরে থাকা মনু চার নম্বরে শেষ করে নিজের তৃতীয় পদক প্যারিসেই ফেলে আসে। একই রকমভাবে মাত্র একটা শটের খুব অল্প ফারাকে পদক হাত ছাড়া হয় অর্জুন বাবুতার। তিনিও শেষ করেন চার নম্বরে। শুটিংয়েই খুব অল্প ব্যবধানে পদক হাত ছাড়া হয় স্কিট মিক্সড টিমের। অন্যদিকে প্রবল প্রতিপক্ষের সঙ্গে দারুন লড়াই করেও সেমিফাইনালে হেরে পদক হাতছাড়া করেন ব্যাডমিন্টনের লক্ষ্য সেন এবং তীরন্দাজিতে ধীরাজ- অঙ্কিতা জুটি। একদম শেষে মাত্র এক কেজির ফারাকে ভারোত্তোলনে চতুর্থ হয়ে পদক হাতছাড়া করেন গতবারের রুপোজয়ী মীরাবাই চানু।

চতুর্থ হয়ে পদক হাতছাড়া হবার অভিশাপ ভারতীয় খেলোয়াড়দের উপর দীর্ঘদিনের। মিলখা সিং, পিটি উষা থেকে আরম্ভ করে বাঙালি জয়দীপ কর্মকার বা দীপা কর্মকার পর্যন্ত অনেকেই চতুর্থ হয়ে পদক হাতছাড়া করেছেন। তবে অলিম্পিকের কোন একটা এডিশনে দুইয়ের বেশি জন চতুর্থ হয়েছেন এমন নজির অতীতে কখনও ছিল না। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এবারে শুধু দুটো নয়, ছ'ছটা মেডেল

প্যারিস অলিম্পিকে নীরজ চোপড়া

হাতছাড়া হয়েছে চতুর্থ স্থানের অভিশপ্ত জায়গায়।

সাম্প্রতিক অতীতে ভারত সরকার টার্গেট অলিম্পিক পোডিয়াম স্কিম কিংবা খেলো ইন্ডিয়ার মতো প্রকল্পের মাধ্যমে একটা বড় অর্থ খরচ করেছে খেলাধুলাতে। তাছাড়া অলিম্পিকে সুযোগ পাওয়া প্রতিটি খেলোয়াড়ের দেশে বিদেশে ট্রেনিং কিংবা আন্তর্জাতিক মানের কোচের ব্যবস্থা অবধি সব করেছে সরকার। স্বাভাবিকভাবেই এরপরে অনেকে প্রত্যাশা করেছিলেন এবারে পদক সংখ্যা দশ ছুঁয়ে যাবে। প্রত্যাশা ভুল নয়। কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে ভাগ্যের দোষে খুব অল্পের জন্য আমরা হাফ ডজন পদক মিস করে এসেছি। আমাদের মাথায় রাখতে হবে ভিনেশ ফোগটের নিশ্চিত পদক হাতছাড়া হয়েছে বিদেশী কোচিং এবং সাপোর্ট স্টাফদের হিসাবের ছোট্ট ভুলে। আমাদের ভুললে চলবে না টেবিল টেনিস-এর মত ইভেন্টে ইতিহাসে প্রথমবারের জন্য আমাদের দু'দুজন মহিলা খেলোয়াড় শেষ ষোলোয় পৌঁছেছে। এরকম বেশ কিছু ইভেন্টে দুর্দান্ত পারফর্ম করলেও ভারতীয়রা মেডেল পায়নি শুধুমাত্র ঠোঁট এবং কাপের ছোট্ট পার্থক্যের কারনে। এই পার্থক্য মুছে যাওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। আশা করা হচ্ছে পরের অলিম্পিকেই পদক সংখ্যা অন্তত পনেরো হয়ে যাবে নিশ্চিতভাবে।

মাত্র পনেরোটি পদক কি খুব বেশি ভারতের মতো ১৪০ কোটির দেশের জন্য। অবশ্যই নয়। কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে প্রথমে ব্রিটিশ আর পরে ছয় দশকের কংগ্রেস শাসন ক্রীড়াক্ষেত্রে আমাদেরকে এতটাই পিছিয়ে দিয়েছে যে ঘুরে দাঁড়াতে আমাদের যথেষ্ট সময় লাগবে। একটা সময় ছিল যখন খেলাধুলার জন্য সরকার বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাতো না। ফলে তখন কোনোবার একটা আধটা পদক আসতো আর কোনোবার সেটুকুও না।

কেন আসতো না সেটা বোঝার জন্য বিজ্ঞানী হতে হয় না। কংগ্রেস আমলে দশকের পর দশক বিশ্বমানের খেলোয়াড়রা ন্যূনতম সুযোগ সুবিধাটুকু পায়নি। কোন এক কংগ্রেসী নেতা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের মাথায় বসে নিজের এবং দলের পকেট ভর্তি করতেই ব্যস্ত থাকতেন। ফলস্বরূপ স্বাধীনতার পর থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত সব মিলিয়ে ষোলোটি এডিশনে মাত্র ১৫ টি পদক জিততে পেরেছিল আমাদের দেশ। অন্যদিকে নরেন্দ্র মোদি সরকারের আমলে শেষ তিনটে এডিশন থেকেই এসেছে সমসংখ্যক অর্থাৎ ১৫ টি মেডেল। শুধু তাই নয় ২০১৪ সালে বিজেপি সরকার আসার আগে পর্যন্ত ১৮ টি অলিম্পিকে ভারত মোট যত টাকা খরচা করেছে তার দ্বিগুণ টাকা প্রতি বছর খেলার বাজেট হিসেবে বরাদ্দ হচ্ছে। আমাদের মনে

রাখতে হবে ভারত সম্ভবত পৃথিবীর একমাত্র দেশ যেখানে জাতীয় স্তরের ভালো ফল করলেই একটা বড় মাইনের সরকারি চাকরি জুটে যায়। এর সাথে বর্তমান সময়ে যুক্ত হবে বিদেশে ট্রেনিং এবং পরিকাঠামোর জন্য বিপুল ব্যয় যা কেন্দ্রীয় সরকার নির্দ্বিধায় বহন করে চলেছে।

সম্প্রতি তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদ সংসদে আগুন ঝরা ভাষণ দিয়ে জানান ভারত সরকার নাকি খেলোয়াড় সাফল্য পেলে তারপর পাশে দাঁড়ায়, আগে নয়। কীর্তি বাবুর জেনে রাখা দরকার ছিল নীরজ চোপড়ার ট্রেনিং থেকে আরম্ভ করে মনু ভাকের বা স্বপ্নীল কুশলেদের মত হাজার হাজার প্রতিভার দেখভাল নিয়মিত করে ভারত সরকার। পদক জেতার অনেক আগে থেকেই ভারত সরকার তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। উল্টোদিকে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার ভোট রাজনীতির নোংরা খেলা নিয়ে মেতে থেকে রাজ্যের ক্রীড়া সংস্কৃতিটাকেই নষ্ট করে দিয়েছে।

এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে রাখা দরকার। ১৯৯১ সালে পি ভি নরসিমহা রাও সরকারে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের সাথে ক্রীড়া মন্ত্রকেরও প্রতিমন্ত্রী ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী হিসাবে ১৯৯২ সালে বার্সেলোনা অলিম্পিকে ভারতীয় দলের সঙ্গে স্পেনেও গিয়েছিলেন তিনি। সেবার ভারত একটাও মেডেল জিততে পারেনি। মমতা ব্যানার্জি অবশ্য স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে ভেঙ্গেও মচকাতে চাননি। নিজের অযোগ্যতাকে ঢাকতে তিনি দাবি করেন বার্সেলোনা অলিম্পিকে 'ঘুরতে গিয়ে' নাকি ভারতের ক্রীড়াক্ষেত্রের সমস্ত ভুল ত্রুটি তিনি বুঝে নিয়েছেন এবং দেশে ফিরেই তিনি এমন পদক্ষেপ করেছেন যাতে পরের অলিম্পিকে ভারত অন্তত দশটা মেডেল জিততে পারে। ঘটনাচক্রে পরের অলিম্পিকে অর্থাৎ ১৯৯৬ সালে ভারত মাত্র একটা ব্রোঞ্জ মেডেল জেতে (লিয়েন্ডার পেজ, টেনিস সিঙ্গেলসে) এবং সেটাও ব্যক্তিগত ইভেন্ট। অবশ্য যিনি ক্ষমতায় এসে তিন মাসের মধ্যেই দাবি করেন সব কাজ করে দিয়েছেন এবং তারপরে রাজ্যটাকে রসাতলে পাঠিয়ে দেন তার কাছে ব্যর্থতার বেশি কিছু প্রত্যাশা করা ভুল।

কেউ প্রতিযুক্তি দিতেই পারেন যে একজন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী হিসেবে কতটাই বা করতে পারতেন তিনি। হ্যাঁ, একথা ঠিক একজন প্রতিমন্ত্রীর কাজের পরিধি কিছুটা সীমিত। কিন্তু তা শূন্য নয়। চাইলে বেশ কিছু কাজ তিনি করতেই পারতেন। আর যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যায় যে কিছু করার ক্ষমতা তার ছিল না তবে সরকারি পয়সা খরচ করে তিনি গেলেনই বা কেন আর ফিরে এসে বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিলেনই বা কেন! সব থেকে বড় কথা ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী হিসেবে তার কাজের পরিধি যদিও সীমিত হয়, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তার ক্ষমতা প্রশ্নাতীতভাবে অনেক। কিন্তু সেখানে তিনি কি করলেন!

উত্তরবঙ্গের মেয়ে স্বপ্না বর্মন। ২০১৮ এশিয়ান গেমসে সোনা পেয়েছিলেন। সোনা পেয়েছেন এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে। ন্যাশনাল রেকর্ড আছে বেশ কয়েকটি। সব পেয়েছেন, শুধু সাপোর্ট পাননি নিজের রাজ্যের থেকে। আজ মাত্র ২৭ বছর বয়সে সরকারি সাহায্য আর স্পনসরের অভাবে ঠিকঠাক প্রস্তুতি টুকু করতে পারছে না জলপাইগুড়ির মেয়েটা। একই অবস্থা অচিন্ত্য- শিউলির। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে ২০২২ সালে কমনওয়েলথে সোনা জেতে হাওড়ার ছেলেটা। মাত্র ১৩ বছর বয়সে আর্মি স্পোর্টস ইনস্টিটিউট তার ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করলেও আজ পর্যন্ত রাজ্য সরকার কোনোভাবে তার পাশে এসে দাঁড়ায়নি। এরপর অঙ্কিতা ভকত। এবারের অলিম্পিকে ভারতীয় মহিলা তীরন্দাজি দলের হাইয়েস্ট র‍্যাংক প্লেয়ার। জন্ম কলকাতায়। কিন্তু রাজ্য সরকারের থেকে ন্যূনতম সাহায্যটুকু না পেয়ে ২০১৪ সালে মাত্র ১৬ বছর বয়সে রাজ্য ছেড়ে চলে যান জামশেদপুর। বাকি ট্রেনিং সেখানেই।

শুধু স্বপ্না, অচিন্ত্য বা অঙ্কিতা নয় - রাজ্য সরকারের থেকে সাহায্য না পাওয়া বিশ্বমানের খেলোয়াড়ের তালিকাটা দীর্ঘ। বরানগরে অতনু দাস, ঝাড়গ্রামের প্রনতি নায়েক, নৈহাটির সুতীর্থা মুখার্জি, কলকাতার অনুশ আগরওয়াল হয়ে মেদিনীপুরের আভা খাটুয়া বা এদের মত আরও অনেকে রাজ্য সরকারের থেকে ন্যূনতম সহযোগিতা পেলে আজকে আন্তর্জাতিক স্তরের খেলোয়াড় হয়ে উঠতে পারতেন অতি সহজে। কিন্তু মমতা ব্যানার্জির সরকার ভোট ব্যাংক ছাড়া কিছু বোঝেনা। তাই প্রকৃত খেলোয়াড়দের সহযোগিতার বদলে ক্লাবগুলোকে কোটি কোটি টাকা দিয়ে ভোটের কাজে লাগানো তৃণমূল নেত্রীর কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। তাই গোটা দেশের ১১০ জন খেলোয়াড় এবারের অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করলেও দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি সংখ্যা সেখানে একপ্রকার শূন্য।

এখানে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন। যেখানে ভারত সরকার পিটি উষার মতো খ্যাতনামা ক্রীড়াবিদকে ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পদে বসিয়েছে, সেখানে ক্ষমতায় এসেই মমতা ব্যানার্জি বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের দায়িত্ব তুলে দেন নিজের ভাই অজিত ব্যানার্জির হাতে। বন্ধুবান্ধব-আত্মীয় দূর অস্ত, অজিত ব্যানার্জি নিজেই কখনো মনে করতে পারবেন না তিনি মাঠে কোনোদিন নেমেছিলেন বলে। এখন স্বজনপোষণ করতে এরকম লোকের হাতে ক্রীড়া সংস্থার দায়িত্ব দিলে সেটা স্বর্গলাভ হতে সময় লাগার কথা নয় এবং সময় লাগেওনি।

একটা সময় ৬০-৭০ জন খেলোয়াড় অলিম্পিকে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করলে সেটাকে কৃতিত্ব হিসেবে ধরা হত। নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পর তিনবারই অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়ের সংখ্যা ১০০ ছাড়িয়েছে। আশা করা যাচ্ছে ভবিষ্যতের এ সংখ্যা আরো বাড়বে। তবে সে দলে বাঙালি কজন থাকবে তার উত্তর এক গভীর প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে।

ফেক নিউজ

কংগ্রেসের 'ফেক নিউজ' কারখানা

আধুনিক ভারতে সবথেকে বেশি ফেক নিউজের সম্মুখীন ভারত সরকারের যে বিভাগকে হতে হয় তা হল রেল। ২০২৪ সালে তৃতীয়বারের জন্য নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হবার পর থেকে ভারতীয় রেল, বিরোধীদের আক্রমণ এবং অন্তর্ঘাতের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে তারা দাবি করছিল যে একটি মালগাড়ি রেল বিভাগের ভুলে লাইনচ্যুত হয়েছে। তাদের দাবি রেল দুর্ঘটনার স্থান উত্তরপ্রদেশের সোনভদ্র।

আসল খবর

কংগ্রেসের দাবি অবশ্য ভুল প্রমাণিত হতে সময় লাগে নি। রেল দপ্তর স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয় (ছবির নীচের অংশে) রেলের কোচ বা ইঞ্জিন কোনটাই ভারতের নয়। অর্থাৎ স্পষ্টতই বিদেশের কোনো ঘটনাকে ভারতের বলে অপপ্রচার করার চেষ্টা করছিল কংগ্রেস।

এমনটা নয় ভারতে রেল দুর্ঘটনা ঘটে না। অবশ্যই ঘটে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে অন্তর্ঘাতের মাধ্যমে রেল দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বিজেপি সরকারকে বদনামের প্রবণতা খুব বেশি বেড়ে গেছে বর্তমান সময়ে। যেমন খুব সম্প্রতি সবরমতী এক্সপ্রেসের বাইশটি কামরা লাইনচ্যুত করে দেওয়া হয়েছে ট্র্যাকে বড় বড় পাথর রেখে। আবার গাড়ির চাকার রিং, লাইনে রেখে রেল লাইনচ্যুত করার চেষ্টা হয়েছে কানপুরে (সঙ্গের দ্বিতীয় ছবি)। কোথাও আবার ঢাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে সিগন্যাল।

আর এসব করেও যখন খুব বড় সংখ্যক রেল দুর্ঘটনা ঘটানো যাচ্ছেনা তখন মিথ্যে খবর ছড়িয়ে ভারত সরকার তথা রেলকে বদনাম করার চেষ্টা চালাচ্ছে কংগ্রেস সহ ইন্ডি জোটের বিরোধী দলগুলি।

বাংলায় ফিশফ্রাই জোটের মিথ্যা প্রচার

বলার অপেক্ষা রাখে না যে মিথ্যা ছড়িয়ে ভারত সরকারকে বদনাম করার ক্ষেত্রে কংগ্রেস-সিপিএমের ইন্ডি জোটের শরিক তৃণমূল খুব একটা পিছিয়ে নেই। সেই মিথ্যার সাগরের নতুন মুক্তো বন্দেভারত এবং হাওড়া বর্ধমান লোকালের একই লাইনে চলে আসার ফেক নিউজ।

আসল খবর

বলার অপেক্ষা রাখে না এ খবর মিথ্যে। ভিডিওটিও এডিট করা। বন্দে ভারতের সামনে দিয়ে একটি লোকাল ট্রেনের অন্য লাইনে চলে যাওয়ার ভিডিওকে এডিট করে তৃণমূলের আইটি সেল এবং সাথে তৃণমূলের বি টিম সিপিএমের অল্পশিক্ষিত ছেলেরা প্রচার করে বন্ধে ভারত এবং লোকাল ট্রেন নাকি একই লাইনে চলে এসেছে এবং খুব অল্পের জন্য দুর্ঘটনা থেকে বাঁচতে পেরেছে।

সিবিআই তদন্ত নিয়ে বাম-তৃণমূল ঢপবাজি

একটি ফেক লেটার সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে দেওয়া হয় তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে। ভাইরাল হওয়া ফেক চিঠিটি দাবি করে আরজিকর মামলা থেকে নিজেদের সরিয়ে নিতে নাকি আবেদন করেছে সিবিআই। এ যাত্রাতেও সিপিএমের ছাত্র যুব

সংগঠন এই মিথ্যে খবরকে ভাইরাল করার বিষয়ে পুরোমাত্রায় সহায়তা করে তৃণমূলকে। মিথ্যে চিঠি ভাইরাল করার মাধ্যমে তৃণমূলের দাবি সিবিআই এক্ষেত্রে ব্যর্থ প্রমাণিত হওয়াতে নিজেদের সরিয়ে নিতে চাইছে।

আসল খবর

একথা অনস্বীকার্য যে নিপুন দক্ষতায় আরজিকর মামলার সব প্রমাণ লোপাট হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ সে ক্ষেত্রে হয়ত

সিবিআইয়ের কাজ কঠিন বাধার সম্মুখীন। কিন্তু তা বলে কোনদিনই কেন্দ্রীয় এজেন্সি সিবিআই আরজিকর মামলার তদন্ত থেকে নিজেদের সরিয়ে নেয়নি। ফেক চিঠি ভাইরাল হওয়ার পর সিবিআই নিজেরাই টুইট করে সত্যিটা জানায়।

'অমায়িক' তৃণমূল

নীতি আয়োগের মিটিংয়ে, যেখানে সিরিয়াল অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের বক্তব্য রাখার কথা ছিল অনেক পরে। কিন্তু রাজ্য সরকারের বিশেষ অনুরোধে কেন্দ্র, মমতা ব্যানার্জিকে বলার অনুমতি দেয় অনেক আগেই। কিন্তু বাইরে এসে তিনি প্রচার করেন তাঁর বক্তব্য রাখার সময় নাকি ইচ্ছাকৃতভাবে মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এরপর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে সব কিছুর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী করে সংবাদমাধ্যমের সামনে ঝাঁজালো বক্তব্য রাখেন তিনি।

আসল খবর

যদিও তথ্য এখানে সত্য নয়। একেবারেই আলাদা। বলে রাখা ভালো নীতি আয়োগের বৈঠকে প্রত্যেক বক্তার বলার জন্য নির্দিষ্ট সময় থাকে এবং সেই নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে গেলে মাইক স্বয়ংক্রিয়ভাবেই অফ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে স্বাভাবিক নিয়মে তার বলার সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পর মাইক স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

ব্লুমবার্গের ভারত বিরোধী মিথ্যা প্রচার

বিজেপির বিরুদ্ধে ফেক নিউজ ছড়ানোর এই খেলা শুধু যে দেশের অভ্যন্তরীণ বিরোধীরাই খেলে তা নয়, জর্জ সরসের মত আন্তর্জাতিক চক্রান্তকারীরাও এর সঙ্গে যুক্ত। তাদেরই পোষা নিউজ পোর্টাল ব্লুমবার্গ দাবি করে গোটা বিশ্বকে খাবার সরবরাহ করায় অগ্রগণ্য ভূমিকা নেওয়া ভারতবর্ষের কাছে নাকি নিজের দেশবাসীকে খেতে দেওয়ার মত যথেষ্ট খাবারই নেই। তাদের দাবি ভারতের হাতে সঞ্চিত খাবারে নাকি মাত্র চার মাস চালানো সম্ভব। উল্লেখ্য দীর্ঘদিন ধরেই কমপক্ষে ৮১ কোটি ভারতবাসীকে বিনা পয়সায় চাল গম সরবরাহ করে ভারত সরকার। তাই ভারত সরকারের হাতে খাদ্যশস্য না থাকা মানে সেটা দেশের জন্য একটা বিরাট সংকট হতে পারে।

আসল খবর

যদিও কয়েকদিনেই স্পষ্ট হয়ে যায় ব্লুমবার্গের এই দাবি একেবারেই মিথ্যে। ভারত সরকার তথা ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার কাছে, গোটা দেশের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য মজুদ আছে। তাই আগামীতে খাদ্যশস্যজনিত সমস্যার কোনও সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়ে দেয় কেন্দ্রীয় সরকারের ফুড এন্ড পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন দফতর।

বাংলাদেশে ভারত বিরোধী অপপ্রচার

বাংলাদেশের আমজনতাকে দিয়ে ভারত বিরোধী আন্তর্জাতিক শক্তিগুলি প্রচার করিয়ে চলেছে যে ত্রিপুরার দাম্বুর নদী থেকে জল

ছাড়ার কারণে নাকি বাংলাদেশে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশের সাধারণ নাগরিকের একটা বড় অংশ এই মিথ্যে প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে তাতে অংশ নিয়েছে। আর মানুষের সহানুভূতি আদায়ের জন্য আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং ফেক নিউজ ব্যবহার করে বেশ কিছু মিথ্যে ছবি ও খবর বাজারে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাতে বাংলাদেশি নাগরিকদের ভারত বিরোধিতা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছে।

আসল খবর

প্রবল বৃষ্টির ফলে শুধু বাংলাদেশ নয়। এমনকি ত্রিপুরা রাজ্যেও প্রবলভাবে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। উল্টোদিকে নদীগুলির নাব্যতা নেমে যাওয়া, সমুদ্রে জোরালো জোয়ার ভাটা আসা এবং বৃষ্টির জল নেমে সমুদ্রে পৌঁছাতেও সমস্যা হচ্ছিল। আসলে কারণ ছিল আবহাওয়া এবং প্রবল বৃষ্টি। এর সাথে বাংলাদেশ বিরোধিতার বা ভারতের জল ছাড়ার কোনোরকম কোনো সম্পর্ক নেই।

৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে নিউদিল্লির লালকেল্লায় গার্ড অব অনার-এ সম্মানিত দেশের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

নিউদিল্লির লালকেল্লায় ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভারতরত্ন শ্রদ্ধেয় অটল বিহারী বাজপেয়ীর প্রয়াণ দিবসে
তাঁর স্মৃতিসৌধ 'সদাইব অটল'-এ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির শ্রদ্ধার্ঘ্য।

ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গ শাখার পক্ষে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অঙ্কিত প্রিন্টিং হাউস, কলকাতা - ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।